মোজেপেড রায়

শ্রী হেমচন্দ্র বক্সী বি-এ

দি বুক কোম্পানী লিমিটেড্
৪-৪ এ, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

দাম বারো আনা

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক
বাঞ্ছারাম অক্রুর লেন, কলিকাতা
হইতে প্রকাশিত।



প্রিণ্টার—শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র ভাচার্য্য
ক্ষিতীশ প্রেস
৩০ নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

লাজপৎ রায়ের জীবনের আদর্শ ও তাঁহার মৃত্যুর স্মৃতি সমগ্র দেশের ন্যায় বাংলাতেও চিরজাগ্রত রাখা প্রয়োজন মনে করি। সেই উদ্দেশ্যে তাঁহার এই ক্ষুদ্র জীবনী প্রকাশিত হইল। মাত্র দুই সপ্তাহের মধ্যে লেখা ও ছাপার কাজ শেষ করিতে হইয়াছে বলিয়া ভুল ত্রুটি এই সংস্করণে হয়তো অনেক রহিয়া গেল। তবু দেশে আজ তাঁহার স্মৃতি-তর্পণের দিনে দেশবাসীর হাতে এই অসম্পূর্ণ জীবনী তুলিয়া দিবার ব্যগ্রতা দমন করিতে পারিলাম না।

এই পুস্তক বিক্রয়ের লভ্যাংশ লাজপৎ রায় স্মৃতি-ভাণ্ডারে অর্পিত হইবে।

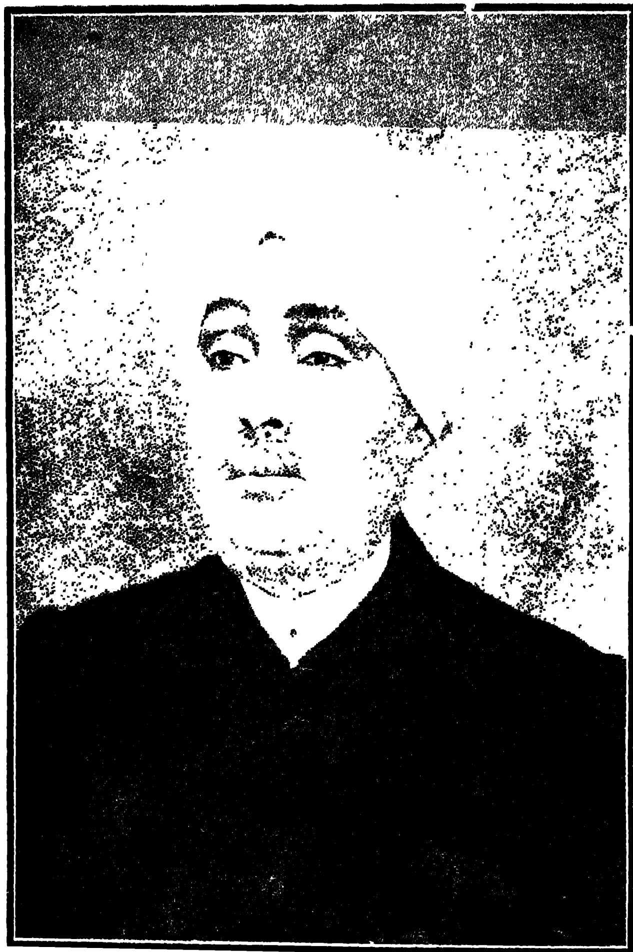
ইতি
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু

কলিকাতা
২৬শে ডিসেম্বর
১৯২৮

শ্রী হেমচন্দ্র বক্সী

সূচী

চিত্র



লালা লাজপৎ রায়

লালা লাজপৎ রায়

পিতামাতা ও শিক্ষা

ইংরেজি ১৮৬৫ সালে পাঞ্জাবের অন্তর্গত লুধিয়ানা জেলায় জাগ্রাওঁ নামক ক্ষুদ্র সহরে লালা লাজপৎ রায় জন্ম গ্রহণ করেন। লাজপৎ রায়ের বংশ বৈশ্য শ্রেণীর আগরওয়ালা সম্প্রদায়ভুক্ত। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ অর্থশালী ছিলেন না বটে, কিন্তু অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত বলিয়া তাঁহাদের খ্যাতি ছিল।

লাজপৎ রায়ের পিতা লালা রাধাকিষেণ ধনী ছিলেন না, কিন্তু সুশিক্ষিত ছিলেন এবং পরবর্ত্তী জীবনে যথেষ্ট খ্যাতিও লাভ করিয়াছিলেন। লালা রাধাকিষেণ প্রথম যৌবনে সরকারী স্কুলে উর্দ্দু ভাষার শিক্ষকরূপে কার্য্য করিতেন। সেই সময় স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী প্রাচীন বৈদিক ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া আর্য্য-সমাজ আন্দোলনের

সৃষ্টি করেন। লালা রাধাকিষেণ মনে প্রাণে সেই আন্দোলনে যোগদান করেন এবং আর্য্য-সমাজভুক্ত হইয়া আর্যসমাজের কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

লালা রাধাকিষেণের সুশিক্ষিত উদার ও সংস্কারমুক্ত মন শুধু ধর্ম্ম ও সংস্কার-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়াই তৃপ্ত হইতে পারে নাই। দেশের রাজনৈতিক অবস্থা তাঁহার হৃদয়ে বেদনার সৃষ্টি করিয়াছিল। তাই তিনি কংগ্রেসের কার্য্যেও সর্ব্বান্তঃকরণে যোগদান করিয়াছিলেন। তখনকার দিনে লালা রাধাকিষেণ একজন উৎসাহী কংগ্রেস-কর্ম্মীরূপে খ্যাত ছিলেন।

লাজপৎ রায়ের মাতাও সাধারণ নারী ছিলেন না। তাঁহার চরিত্রেও যথেষ্ট বিশিষ্টতা ছিল। পিতার মত মাতার শিক্ষাও লাজপৎ রায়ের জীবনে যথেষ্ট ফলবতী ছিল। লাজপৎ রায় মিতব্যয়ীতা ও অনাড়ম্বর জীবন যাপনের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। বস্তুতঃ, এই সব গুণ তিনি মাতার চরিত্র হইতেই উত্তরাধিকারী সূত্রে লাভ করিয়াছিলেন। মাতার স্মৃতি লাজপৎ রায়ের হৃদয়ে চিরজীবন অক্ষয়ভাবে মুদ্রিত ছিল।

নিজে শিক্ষক ছিলেন এবং সুশিক্ষার মর্য্যাদা বুঝিতেন বলিয়া লালা রাধাকিষেণ পুত্রকে সুশিক্ষা দিবার জন্য অত্যন্ত

সচেষ্ট ছিলেন এবং নিজেই তাঁহার শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। লাজপৎ রায় পিতামাতার প্রতি অতিশয় ভক্তিমান ছিলেন এবং তাঁহাদের শিক্ষায় ও আদর্শে জীবন গঠন করিয়া নিজেও আদর্শপুরুষ হইয়াছিলেন।

স্কুলের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া লাজপৎ রায় লাহোরে গবর্ণমেণ্ট কলেজে ভর্ত্তি হন। এখানে তিনি দুই বৎসর সরকারী-বৃত্তিভোগী ছিলেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে তিনি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রথম আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ত্রিশজন ছাত্রের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া সেই সময়কার 'লাইসেনসিয়েট্ ইন্ ল' নামক আইনের উপাধি লাভ করেন। তৎপর তিনি হিসার নামক ক্ষুদ্র সহরে আইন-ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন।

আর্য্যসমাজ ও লাজপৎ রায়

লাজপৎ রায়ের জীবনের পর্য্যালোচনা করিতে গেলে সর্ব্বপ্রথমেই আর্য্যসমাজের কথা বলা প্রয়োজন। কারণ আর্য্যসমাজের কাজেই তাঁহার জীবন প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে। তাঁহার জীবনের অধিকাংশ শক্তি, সময় ও অর্থ এই আর্য্যসমাজের কাজেই তিনি নিয়োগ করিয়া গিয়াছেন।

পরবর্ত্তী জীবনে তিনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সর্ব্ববাদীসম্মত নেতৃত্বপদ লাভ করিলেও আর্য্যসমাজ হইতে তাঁহার জীবন বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিবার উপায় নাই। তিনি নিজমুখেই বলিয়াছেন,—"যাহা-কিছু সামান্য ভাল আমার ভিতরে আছে তাহা আমার জনকজননী ও আর্য্যসমাজ হইতে প্রাপ্ত।"

বস্তুতঃ, আর্য্যসমাজের সহিত লালাজীর জীবন অচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত। কিন্তু আর্য্যসমাজের কাজে তিনি কি কি করিয়াছিলেন সে কথা বলিবার পূর্ব্বে আর্য্যসমাজ কি বস্তু তাহা সাধারণ বাঙালী পাঠককে বলিবার প্রয়োজন আছে। আমরা এখানে সংক্ষেপে সেই চেষ্টা করিব।

লাজপৎ রায়

স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে গুজরাটে জন্মগ্রহণ করেন। বহুদিন সন্ন্যাসীভাবে জীবন কাটাইয়া ও নানা শাস্ত্রালোচনা করিয়া তিনি যে-সত্যে উপনীত হন, শেষ জীবনে তিনি তাহা লোক-সমাজে প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। তিনি একজন সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষ ও অতি ক্ষমতাশালী ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কারক ছিলেন। অচিরেই বহুলোক তাঁহার প্রচারিত মত অবলম্বন করিয়া প্রচলিত সনাতন হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজ হইতে পৃথক হইয়া এক নূতন হিন্দু বা আর্য্যসম্প্রদায় গঠন করিয়া তুলিলেন। ইহাই আর্য্যসমাজ।

বাংলার ব্রাহ্মসমাজের সহিত পশ্চিম ভারতের এই আর্য্যসমাজের বহুপ্রকারে সাদৃশ্য রহিয়াছে। সমাজ সংস্কারের দিক দিয়া উভয় সমাজই প্রায় একই মতাবলম্বী। জাতিভেদ, বিবাহ, নরনারীর অধিকার, অন্যধর্ম্মাবলম্বীদিগকে হিন্দুধর্ম্মে গ্রহণ প্রভৃতি বিষয়ে উভয় সমাজের আদর্শে বিশেষ কোনো পার্থক্য নাই। ধর্ম্মবিষয়ে উভয় সম্প্রদায়ই একেশ্বরবাদী এবং পৌত্তলিকতার বিরোধী। তবে আর্য্যসমাজ বেদ অভ্রান্ত ও ঈশ্বরপ্রদত্ত বলিয়া মনে করেন এবং তাঁহাদের ধর্ম্ম ও সমাজ সম্পূর্ণভাবে বৈদিক মতামতের উপর গঠিত। অপরপক্ষে, ব্রাহ্মধর্ম্ম উপনিষদের তত্ত্বজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত

এবং উহার সমাজসংস্কারের দিক বিশেষভাবে বিচার-শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, এইরূপ সংস্কারপন্থী আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রাচীনপন্থী গোড়াদের ভিতর হইতে অনেকেই দণ্ডায়মান হইয়া ইহা নষ্ট করিবার চেষ্টা করিবে। বাস্তবিকক্ষেত্রে হইয়াও ছিল তাহাই। কিন্তু আর্য্যসমাজের দীক্ষা লইয়া তিনটি অক্লান্তকর্ম্মী যুবক এই বিরুদ্ধ-আন্দোলন নিরস্ত করিবার জন্য অসীম উৎসাহের সহিত অগ্রসর হইলেন। এই তিনটি যুবকের নাম লালা লাজপৎ রায়, লালা হংসরাজ এবং পণ্ডিত গুরুদত্ত বিদ্যার্থী। লালা হংসরাজ পরে দয়ানন্দ কলেজের অধ্যক্ষ হন, কিন্তু পণ্ডিত গুরুদত্ত বিদ্যার্থী মাত্র ২৫ বৎসর বয়সেই মৃত্যুমুখে পতিত হন,—যদিও এই অল্প বয়সেই আর্য্যসমাজের জন্য তিনি যথেষ্ট কাজ করিয়া গিয়াছিলেন।

এইভাবে এই তিনটি যুবক আর্য্যসমাজের পক্ষ লইয়া অক্লান্তভাবে কাজ করিতে লাগিলেন। এই কার্য্যে তাঁহা-দিগকে পাঞ্জাবের সর্ব্বত্র যাতায়াত করিতে হইত। সেই সময়কার আর্য্যসমাজের ইতিহাসে এই তিনটি যুবকের প্রচেষ্টা এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। সর্ব্বত্র তাঁহারা আর্য্যসমাজের ধর্ম্মমত প্রচার, পাঠ, বক্তৃতা ও আলোচনা দ্বারা সুদৃঢ়ভাবে এই নূতন

ধর্ম্মমতের ভিত্তি স্থাপন করিলেন। খৃষ্টধর্ম্মের Trinity বা ত্রয়ী অনুসারে God, the Father; God, the Son; God, the Holy Ghost এই তিন রূপ আছে। ইহারই অনুকরণে পাঞ্জাবের লোকেরা এই অদ্ভুতকর্ম্মা ত্রয়ী—এই তিন যুবকের নামকরণ করিয়াছিল। হংসরাজ ছিলেন 'পিতা', গুরুদত্ত ছিলেন 'পবিত্রআত্মা' আর লাজপৎ রায় ছিলেন 'পুত্র।'

একই বয়সী এই তিনজন প্রায় একসঙ্গেই থাকিতেন। মনে রাখিতে হইবে তখন তাঁহারা নবীন যুবক—কলেজের ছাত্র। বাহিরের এত সব কাজ করা সত্ত্বেও পড়াশুনার প্রতি তাঁহারা অমনোযোগী ছিলেন না। পরীক্ষাতে তাঁহারা প্রথম বা দ্বিতীয়স্থান অধিকার করিতেন।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে প্রধানতঃ এই তিনটি যুবকের চেষ্টাতেই লাহোরে 'দয়ানন্দ এ্যাংলো বৈদিক কলেজ' নামে একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ স্থাপিত হয়। এই কলেজ পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত থাকিয়া এম-এ পর্য্যন্ত শিক্ষাদান করিয়া থাকে। কিন্তু সাধারণ কলেজ হইতে এই কলেজের উদ্দেশ্য ও শিক্ষাদানে বিভিন্নতা আছে। প্রধানতঃ নিম্নের চারিটি উদ্দেশ্য লইয়া এই কলেজ স্থাপিত হয়।—(১) হিন্দি ভাষা ও হিন্দি সাহিত্যের শিক্ষাদান ও প্রচার, (২) প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার উন্নতিবিধান, (৩) ইংরেজী

শিক্ষার প্রচার এবং (৪) ব্যাবহারিক্ শিল্প শিক্ষা ও সাহিত্যের প্রচার।

এই সমস্ত আদর্শ ও শিক্ষাপদ্ধতি হইতে স্পষ্টই প্রতীয়-মান হইবে যে উদ্যোক্তাগণ অতি উচ্চাঙ্গের স্বাদেশিকতার ভাবে প্রণোদিত হইয়া এই কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহাদের এই উদ্দেশ্য বিফল হয় নাই। অতি উচ্চাঙ্গের শিক্ষা সেখানে দেওয়া হয় এবং বর্ত্তমানে উহা পাঞ্জাবের একটি শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়।

আর্য্যসমাজীদের দ্বারা স্থাপিত এই দয়ানন্দ কলেজই একমাত্র শিক্ষা-আয়তন নয়। এই সমাজ প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকা নানাপ্রকার জনহিতকর কার্য্যে ব্যয় করিয়া থাকে। ইহার অধিনে সাতটি কলেজ ও বহুসংখ্যক উচ্চ বিদ্যালয় এবং অনেকগুলি বালিকা বিদ্যালয় চলিতেছে। ফিরোজপুরে ইঁহাদের একটি অতি বৃহৎ অনাথ আশ্রম আছে। ইহা ছাড়া নানাস্থানে ছোট বড় আরো অনেকগুলি অনাথ-আশ্রম ইঁহারা পরিচালনা করিয়া থাকেন। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের পশ্চাতে লালা লাজপৎ রায় ও লালা হংসরাজের চেষ্টা ও অধ্যবসায় প্রভূত পরিমাণে বিদ্যমান রহিয়াছে।

দয়ানন্দ কলেজ যখন স্থাপিত হয়, লালা লাজপৎ রায় তখনো হিসারে ওকালতি করেন। আর্য্যসমাজ ও জনহিতকর

কার্য্যে তাঁহার কম সময় ব্যয়িত হইত না। তথাপি তাঁহার উদ্যম ক্ষমতা ও বক্তৃতা শক্তি দ্বারা অচিরেই আইন-ব্যবসায়ে তিনি যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করিলেন।

হিসারে থাকাকালীন তিনি তথাকার মিউনিসিপালিটির সেক্রেটারি ছিলেন এবং এই দিক দিয়াও সেই সহরের যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র পঁচিশ বৎসর।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দে তিনি হিসার ত্যাগ করিয়া লাহোরে উঠিয়া আসিলেন এবং সেখানে ওকালতি আরম্ভ করিলেন। লাহোরে আসাতে তাঁহার ব্যবসার যেমন অধিকতর সুবিধা হইল তেমনি জন-সেবায়ও তিনি বৃহত্তর কার্য্যক্ষেত্র লাভ করিলেন।

অনাথ-সহায়ক আন্দোলন

এই হতভাগ্য দেশে দুর্ভিক্ষের অভাব নাই। যে কারণেই হউক দুর্ভিক্ষ এদেশে প্রায় নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। কোথাও না কোথাও প্রতিবৎসর দুর্ভিক্ষ লাগিয়াই আছে। ইহার উপর ভগবান যখন বিশেষভাবে বিরূপ হন, তখন ইহা রুদ্রমূর্ত্তি ধরিয়া এমন রূপ ধারণ করে যে লক্ষ লক্ষ নরনারী ইহার করাল কবলে পতিত হয়।

ইহা যেমন পরিতাপের বিষয় তেমনি ইহার আরেকটা দিক যাহা আছে, যাহা খুব কম লোকেই ভাবিয়া দেখে; কিন্তু পরিতাপের বিষয় উহাও কম নয়। এইসব দুর্ভিক্ষের সময় সহস্র সহস্র লোক মারা যায়। কিন্তু তাহাদের সন্তানদের অবস্থা দেশের দিক দিয়া কয়জন লোকে ভাবিয়া দেখে? বহু বালকবালিকা অনাহারে রোগে মারা যায় সত্য, কিন্তু পিতামাতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বহুসংখ্যক বালকবালিকা বাঁচিয়া থাকা সত্ত্বেও হিন্দু বা মুসলমান সমাজ হইতে চিরতরে বিসর্জ্জিত হয়। খৃষ্টধর্ম্মের মিশনসমূহ তৎপর হইয়া এই সমস্ত বালক বালিকার জীবন রক্ষার্থে উপস্থিত হয়। ফলে

প্রত্যেক দুর্ভিক্ষে হাজার হাজার বালকবালিকা খৃষ্টধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে,—হিন্দু বা মুসলমান সমাজ চিরদিনের জন্য এই সব শিশুদিগকে হারাইয়া ফেলে। একমাত্র রাজপুতানার দুর্ভিক্ষেই ৭০ হাজার বালক বালিকা হিন্দুসমাজের ক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া খৃষ্টসমাজে চলিয়া গিয়াছে।

এই অবস্থা লালা লাজপৎ রায়ের হৃদয়ে দারুণ ক্ষোভের সৃষ্টি করিল। তিনি লাহোরে আসিয়া বসিবার পাঁচ বৎসর পরে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে এক দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইল। লালা লাজপৎ রায় তখন আর্য্যসমাজের পক্ষ হইতে এক অনাথ-সহায়ক আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইলেন। ১৮৯৯-১৯০০ সনেও পুনরায় যখন দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইল তখনো তিনি আবার এই কাজে ব্যপৃত হইলেন। তাঁহার এই প্রচেষ্টার ফলে মধ্যপ্রদেশ, রাজপুতানা ও পূর্ব্ববঙ্গ হইতে দুই হাজারের বেশি অনাথ বালকবালিকা তিনি আর্য্যসমাজের পক্ষ হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ফিরোজপুরে তিনি একটি বৃহৎ অনাথ-আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা আধুনিক রীতিতে পরিচালিত হয় এবং উত্তর-ভারতে হিন্দুদের দ্বারা পরিচালিত ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ অনাথ-আশ্রম। ইহা ছাড়া মীরাটে বৈশ্য অনাথ-আশ্রমও হিন্দুদের দ্বারা পরিচালিত একটি বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান। এই

উভয় আশ্রমের সহিতই লাজপৎ রায় সর্ব্বতোভাবে সংযুক্ত ছিলেন। প্রথম প্রতিষ্ঠানটি সম্পূর্ণভাবে তাঁহার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইত এবং দ্বিতীয়টির পরিচালকবর্গের মধ্যে তিনি একজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন।

এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত থাকিয়া এইরূপ আশ্রম স্থাপন ও পরিচালনা সম্বন্ধে তিনি প্রভূত জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। এই কাজে তাঁহার সময় শক্তি এবং অর্থও কম ব্যয়িত হইত না। সমস্ত কাজই তাঁহাকে নিজে করিতে হইত। জনসাধারণের নিকট এই সকল বালকবালিকাদের দুর্দ্দশা বর্ণনা করা, তাহাদের জন্য অর্থসংগ্রহ করা, এই কাজে স্বেচ্ছাসেবক নিযুক্ত করা এবং তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া ও স্থানে স্থানে প্রেরণ প্রভৃতি কত রকম কাজই যে আছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। বস্তুতঃ, কোনো বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের পশ্চাতে কর্ম্মীদিগকে কতরকম কাজই যে করিতে হয়, যাঁহারা কার্যাক্ষেত্রে আছেন তাঁহারাই শুধু তাহা বুঝিতে পারেন।

এই কাজে ব্যপৃত থাকিয়া তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলেন গবর্ণমেণ্ট কি ভাবে এবং কি উপায়ে দুর্ভিক্ষের সময় সাহায্য-কার্য্যে অগ্রসর হয়। শত সহস্র শিশু স্থানান্তরিত হইয়া নানা জায়গায় খৃষ্টান মিশনে আশ্রয় পায় এবং ফলে

তাহারা হিন্দুসমাজ ও ধর্ম্ম হইতে চিরকালের জন্য বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। অপর দিকে মিশনের কাজ দ্রুত অগ্রসর হইতে থাকে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে একমাত্র রাজপুতানার দুর্ভিক্ষে ৭০,০০০ শিশু খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়। কারণ স্বধর্ম্মী ও স্বজাতীয়দের এইরূপ প্রচেষ্টা ও প্রতিষ্ঠান নাই।

উপর্য্যুপরি এইরূপ দুর্ভিক্ষ হওয়ায় ১৯০১ সনে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক দুর্ভিক্ষ-কমিশন বসিল। উহার সভাপতি ছিলেন স্যার এণ্টনি ম্যাকডোনেল। লাজপৎ রায়কে এই কমিশনে সাক্ষ্য দিবার জন্য আহ্বান করা হয়। কিরূপে শত শত শিশু স্বধর্ম্ম ও সমাজ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ে, এই কথা লাজপৎ রায় অতি প্রাঞ্জলভাবে কমিশনকে বুঝাইয়া দেন এবং কমিশন তাহা স্বীকার করিতে বাধ্য হন। ইহা যে হিন্দুধর্ম্মের পক্ষে কতখানি ক্ষতিকর কমিশন তাহা বুঝিতে পারিলেন এবং এ বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া কমিশন তাহাদের মত ব্যক্ত করেন।

লাজপৎ রায়ের এই চেষ্টার ফলে কমিশন লিখিলেন,— "দুর্ভিক্ষের সময় গবর্ণমেণ্টেরই পরিত্যক্ত শিশুদের অভিবাবক হওয়া উচিত এবং দুর্ভিক্ষ শেষ হওয়ার পর কিছুকাল পর্য্যন্ত এই শিশুরা গবর্ণমেণ্টেরই অভিবাবকত্বের অধীনে বাস করিবে। এই সময় গবর্ণমেণ্ট শিশুদের স্বাভাবিক

অভিভাবকদিগের সন্ধান করিবে ; তাঁহাদের না পাওয়া গেলে শিশুদের স্বধর্ম্মী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা উহাদিগকে গ্রহণ করেন কিনা সেই চেষ্টা গবর্ণমেণ্টের করা উচিত। সম্পূর্ণভাবে এই সব চেষ্টা না হওয়া পর্য্যন্ত অন্য ধর্ম্মের কোনো লোক বা প্রতিষ্ঠানের হস্তে ইহাদিগকে অর্পণ করা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য নয়।"

কমিশনের এই অভিমত অত্যন্ত মূল্যবান। এই অভিমত অনুযায়ী কার্য্য করা যাহাতে সম্ভব হয়, সেইজন্যও কমিশন কতকগুলি নিয়ম প্রণয়ণ করিয়াছেন। যাহাতে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এই ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন, সেইজন্য বে-সরকারী আশ্রমগুলি সম্বন্ধেও কতকগুলি নিয়ম কমিশন প্রণয়ণ করিয়াছেন। এই নিয়ম অনুসারে বে-সরকারী আশ্রমগুলিকে প্রত্যেক শিশুর সম্পূর্ণ পরিচয় ও বিবরণ একটি রেজিষ্টারি বহিতে রাখিতে হইবে এবং তাহার নকল মাঝে মাঝে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে পাঠাইতে হইবে, যাহাতে ম্যাজিষ্ট্রেট শিশুদের পিতামাতা বা অভিবাবকের সন্ধান করিতে সমর্থ হন।

ইহা ছাড়া কমিশন আরো একটি মূল্যবান নিয়মও প্রবর্ত্তন করেন। তাঁহারা বলেন যে, যে-সব ব্যক্তি শিশুদের পিতামাতা বা অভিবাবক বলিয়া অনাথ-আশ্রমে আসিয়া

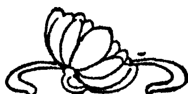
উপস্থিত হইবে, আশ্রমের ভিতর গিয়া নিজেদের শিশুদিগকে খুঁজিয়া লইবার অধিকার তাহাদের থাকিবে।

দুর্ভিক্ষের সময় পরিত্যক্ত শিশুদিগকে গবর্ণমেণ্ট অতি সত্বর দূরদেশস্থ নানা অনাথ-আশ্রমে (খৃষ্টান মিশনারি পরিচালিত) পাঠাইয়া দিত। ইহাতে উপরোক্ত বিধানগুলি কার্য্যকরী হইতে পারে না। ইহা বন্ধ করিবার জন্য কমিশন এই নিয়ম প্রবর্ত্তন করিলেন যে, কোনো পরিত্যক্ত শিশুই সেই জেলার দুর্ভিক্ষ-সাহায্য বন্ধ হইবার পর তিন মাস মধ্যে সেই জেলা হইতে স্থানান্তরিত হইবে না।

কি হিন্দু সমাজের দিক দিয়া, কি এই সব অনাথ শিশুদের দিক দিয়া লাজপৎ রায়ের এই প্রচেষ্টা ও তাহার সফলতা চিরকালের জন্য অতি মূল্যবান বিষয় হইয়া থাকিবে।

এই সম্পর্কে লাজপৎ রায়ের আরেকটি লোকহিতকর কাজের উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ইহা তাঁহার ১৯০৫ সনের ভূমিকম্পের পর কাঙ্গরাতে সাহায্য প্রদান। ১৯০৫ সনের ভূমিকম্পে কাঙ্গরায় ভীষণ সর্ব্বনাশ সংঘটিত হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট কাঙ্গরায় এই ভূমিকম্পে প্রপীড়িত লোকদের সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহাদের সাহায্য এমনি সামান্য ও খামখেয়ালিভাবে

চলিতেছিল যে উহার উপর নির্ভর করা যায় না। তখন লাজপৎ রায় লাহোরের আর্য্যসমাজের পক্ষ হইতে একটি সাহায্য কমিটি গঠন করিলেন এবং উহার সেক্রেটারিরূপে অর্থসংগ্রহ করিয়া ও সেই সমস্ত স্থান নিজে পরিদর্শন পূর্ব্বক প্রপীড়িত লোকেদেরে অর্থ ও নানাভাবে সাহায্য করিয়া তাহাদের চিরকৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছিলেন।



চরিত্রের একটি বিশিষ্টতা

মহাপুরুষের জন্ম খুব অধিক ঘটে না। অসংখ্য জনমণ্ডলীর ভিতর ক্বচিৎ দুটি-একটি প্রতিভাশালী মহাপুরুষের জন্ম হয়। লাজপৎ রায় সেই অল্প সংখ্যক অতি-মানবের একজন। প্রতিভাশালী পুরুষদের জীবনে দেখা যায়, তাঁহাদের প্রতিভা সচরাচর এক-মুখী—বহুধা বিভক্ত তাহাদের কর্ম্মপ্রচেষ্টা নয়। ধর্ম্মক্ষেত্রে যাঁহাদের প্রতিভা পরিস্ফুট, তাঁহাদের কর্ম্মপ্রচেষ্টা ধর্ম্মক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। তেমনি লোক-সেবায় যাঁহারা অতি-মানব, অন্য বহু ক্ষেত্র তাঁহাদের শক্তি ও সেবা হইতে বঞ্চিত। এই ভাবে দেখা যায়, প্রতিভা বা শক্তি-সম্পন্ন মহাপুরুষদের কর্ম্মক্ষেত্র সাধারণতঃ স্বল্পপরিসর বা সীমাবদ্ধ।

আর্য্যসমাজের মূলসূত্র দেখিতে গিয়া ইতিপূর্ব্বে আমরা উহাকে বাংলার ব্রাহ্ম-সমাজের সহিত তুলনা করিয়াছি। সেই তুলনা এখানে আরেক দিক দিয়া একটু দীর্ঘতর করিতে চাই। ব্রাহ্ম-সমাজের প্রবর্ত্তকের হৃদয়ে ভারতের জন্য যে উচ্চ রাজনৈতিক আদর্শ বদ্ধমূল ছিল, তাঁহার বর্ত্তমান শিষ্যদের মধ্যে সেই আদর্শের বহুল প্রচার নাই। ধর্ম্ম ও সমাজ

সংস্কারে যাঁহারা অলোকের বর্ত্তিকা হস্তে অগ্রগামী হইয়া বিপুল জনসঙ্ঘকে পথ দেখাইয়া চলিয়াছেন, রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তাঁহারাই পথপ্রদর্শক হইবেন ইহাই স্বাভাবিক ও সুসঙ্গত। কিন্তু তাঁহারা সেই অধিকার অর্জ্জন করিতে পারেন নাই।

এই অস্বাভাবিক অবস্থার কারণ কি? অন্যান্য বহুবিধ কারণের মধ্যে একটি কারণ এই মনে হয় যে, প্রাচীন ব্রাহ্মেরা, যাঁহারা ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কারের জন্য সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহারা মনে করেন যে, এই ক্ষেত্রেই এত কাজ করিবার আছে যে, উহাই একজন লোকের পক্ষে যথেষ্টের চেয়েও বেশি। ঐ ক্ষেত্রেই তাঁহাদের প্রতিভা সীমাবদ্ধ।

ঠিক এই মনোভাব আর্য্য-সমাজীদের ভিতরও বর্ত্তমান আছে। তাঁহাদের অনেকেই মনে করেন যে, আর্য্যসমাজের নিজস্বই এত কাজ আছে যে, তাঁহাদের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যাইবার প্রয়োজন নাই। এমন কি, লালা লাজপৎ রায়ের পরম বন্ধু লালা হংসরাজও ইহাই মনে করিতেন যে, আর্য্য-সমাজ ও উহার অভ্যন্তরস্থ জনহিতকর প্রতিষ্ঠানগুলিতেই এত কাজ রহিয়াছে যে, উহাই তাঁহাদের জীবনের পক্ষে যথেষ্ট—তাঁহাদের অন্য কাজে আত্মনিয়োগ করিবার প্রয়োজন নাই।

কিন্তু এই জায়গাতেই লাজপৎ রায়ের চরিত্রের বিশিষ্টতা। তিনি তাঁহার বন্ধুর সহিত একমত হইতে পারেন নাই। তাঁহার মত ছিল এই যে, যদিও আর্য্যসমাজের কাজ সর্ব্বথা প্রয়োজনীয় তথাপি যাঁহারা ঠিক আর্য্যসমাজভুক্ত নন অথচ একই দেশবাসী—একই দেশমাতার সন্তান, তাঁহাদের জন্য আত্মনিয়োগ করাও প্রত্যেক উন্নতমনা ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য। তাই তিনি প্রথম যৌবনেই অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকেদের সহিত সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কার-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সর্ব্বদিক দিয়া সর্ব্ব বিষয়েই দেশের উন্নতি হউক, ইহাই তাঁহার কামনা ও জীবনের আদর্শ ছিল।

কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আর্য্যসমাজ হইতে তিনি বিন্দুমাত্রও সরিয়া যান নাই—আর্য্যসমাজ তাঁহার নিকট আপন প্রাণের চেয়েও প্রিয়তর ছিল। যত দিন যাইতে লাগিল, আর্য্যসমাজ ততই তাঁহার প্রাণের বস্তু হইয়া উঠিতেছিল। আর্য্যসমাজের কার্য্যসমূহের একটি প্রকাশ—লাহোরের দয়ানন্দ কলেজ। উহা তাঁহার এতই প্রিয় হইয়া উঠিল যে, কলেজের সন্নিকটে একটি বাড়ী ক্রয় করিয়া সেখানে বাস করিতে লাগিলেন এবং সময় সময় কলেজে শিক্ষাদান কার্য্যও নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। তিনি এই কলেজের সেক্রেটারি এবং ভাইস্-প্রেসিডেণ্টরূপেও ইহার জন্য কম পরিশ্রম করিয়া যান নাই।

ইহা ছাড়া, বহুবৎসর তিনি তাঁহার আয়ের অধিকাংশ এই কলেজে দান করিয়া গিয়াছেন। উহার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার টাকার বেশি।

লাজপৎ রায়ের রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ—আর্য্যসমাজের অনেকে হয়তো নিজেদের ক্ষতি বলিয়া মনে করিতেন। কেহ কেহ আবার এইরূপও মনে করিতেন যে, লাজপৎ রায় যখন সরকার-বাহাদুর কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন, তখন আর্য্যসমাজের লোকেরা তাঁহার প্রতি উপযুক্ত সহানুভূতি প্রদর্শন করেন নাই। এই সম্পর্কে লাজপৎ রায় যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার মত চরিত্রেরই উপযুক্ত কথা। আর্য্যসমাজ যে তাঁহার নিকট কত প্রিয় তাহাই তিনি সরল অকপট হৃদয়ে মধুরভাবে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।

তিনি বলিয়াছেন,—"এমন কেহ কেহ আছেন যাঁহারা আমাকে বলেন যে, আমার অনুপস্থিতির সময় আর্য্যসমাজ আমার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করেন নাই। এমন কি অদ্যও আমি একখানা চিঠি পাইয়াছি, যাহাতে লেখক লিখিয়াছেন যে, আর্য্যসমাজ যদি আমার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন না করে, তবে আমার আর্য্যসমাজভুক্ত হইয়া থাকা উচিত নয়। আমার ভগবানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আপনাদিগকে আমি এই কথা বলিতেছি যে, আর্য্যসমাজে যখন আমি প্রবেশ

করি তখন ইহার কোনোরূপ নায়কত্বের লোভে আমি আসি নাই; বস্তুতঃ উহার শিক্ষা ও আদর্শের জন্যই আসিয়াছিলাম এবং তাহাতে আমার জীবন উন্নত ও পবিত্রতর হইয়াছে। আমি ইহার জন্য যদি কোনো কাজ করিয়া থাকি তাহাতে আমারই নিজের জীবন মার্জ্জিত ও পবিত্র করিতে সক্ষম হইয়াছি। যাহা-কিছু সামান্য ভাল আমার ভিতর আছে, তাহা আমার জনকজননী ও আর্য্যসমাজ হইতে প্রাপ্ত। যদি সহস্র সহস্র লোকের ভিতর হইতে কেহ আমার নিন্দা করিয়া থাকেন, তবে আমার ভগবানের সম্মুখে এই বক্তৃতামঞ্চ হইতে তাঁহাকে আমি ক্ষমা করিতেছি। সমালোচনা, নিন্দা বা অকৃতজ্ঞতার এ সময় নয়—এখন পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতে হইবে। আর্য্য সমাজের জন্য গত পঁচিশ বৎসর ব্যাপিয়া আমি পরিশ্রম করিয়াছি এবং কিছু কাজ করিতেও সক্ষম হইয়াছি। যদিও আমি যে-ধর্ম্মমতে বিশ্বাস করি এবং যাহা হইতে আমি এত উপকৃত হইয়াছি তাহা আমি পরিত্যাগ করিতে পারি না, তথাপি আর্য্যসমাজের কোনো নেতা যদি আমাকে বলেন যে, আমার রাজনৈতিক মতের জন্য আর্য্যসমাজের ক্ষতি হইয়াছে, তাহা হইলে সেই মুহূর্ত্তে আমি নিজেকে ইহা হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে প্রস্তুত আছি।”

রাজনৈতিক জীবন

রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রবেশ

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি লাজপৎ রায়ের পিতা লালা রাধাকিষেণ রাজনীতির চর্চ্চা করিতেন। তিনি একজন উৎসাহী কংগ্রেস-কর্ম্মীও ছিলেন এবং তখনকার দিনের রাজনৈতিক ইতিহাসে তাঁহার নাম অখ্যাত ছিল না। কাজেই দেখা যায়, রাজনীতি-চর্চ্চা তাঁহার বংশগত। লালাজীর রক্তের ভিতর রাজনীতির সেবায় আত্মবিসর্জ্জনের বীজ নীহিত ছিল।

কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তিনি কি-ভাবে প্রবেশ করিলেন তাহার ইতিহাস সকলের জানা নাই। স্যার সৈয়দ আহ্‌মেদ খাঁর নাম এখন সাধারণ পাঠকের নিকট সুপরিচিত নয়। কিন্তু এই স্যার সৈয়দ আহ্‌মেদকে অবলম্বন করিয়াই লালাজীর রাজনৈতিক জীবনের প্রথম উন্মেষ হয়।

স্যার সৈয়দ সম্বন্ধে আমাদের এখানে অধিক বলিবার সুযোগ না ঘটিলেও সংক্ষেপে এক কথায় তাঁহার পরিচয় এই

দেওয়া যায় যে, প্রথম জীবনে তিনি যে-সব মতামত ব্যক্ত করিতেন, তাহা প্রায় বর্ত্তমানকালের মডারেটদের অনুরূপ। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দির মধ্যভাগে ঐরূপ মতের মূল্য ও ক্ষমতা কম ছিল না। এই সমস্ত মতামতে তিনি সর্ব্বদা জনসাধারণের পক্ষ লইয়া কথা কহিতেন।

স্যার সৈয়দের প্রথম জীবনের কয়েকটি প্রশংসনীয় মত এখানে বিবৃত করিতেছি। তিনি মনে করিতেন, কাউন্সিল-সমূহে দেশবাসীদের মতামত ব্যক্ত করিবার অধিকার থাকা গবর্ণমেণ্টের উন্নতি, এমন কি স্থায়িত্বের পক্ষে অবশ্য-প্রয়োজনীয়। একমাত্র জনসাধারণের মতই গবর্ণমেণ্টের ভুল সংশোধন করিতে এবং ভবিষ্যৎ বিপদ হইতে গবর্ণমেণ্টকে রক্ষা করিতে সক্ষম। পার্লিয়ামেণ্টের অনুকরণে ভারতবর্ষেও ক্ষুদ্র পার্লিয়ামেণ্ট স্থাপনের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন এবং ভারতবাসীরা যেন উহাতে সদস্য প্রেরণ করিতে পারে, এইরূপ ইচ্ছা করিতেন। তিনি এমনও বলিতেন যে, ব্রিটিশ পার্লিয়ামেণ্টের মত প্রতিষ্ঠানের কার্য্যপদ্ধতির সহিত ভারত-বাসীরা সম্পূর্ণ সুপরিচিত। হিন্দু ও মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের প্রকৃত মিলনের তিনি অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বলিতেন যে, উভয় সম্প্রদায়ের স্বার্থে কোনো তারতম্য নাই ; এমন কি তিনি এতদূরও বলিয়াছেন যে, হিন্দু

ও মুসলমান এই উভয় সম্প্রদায় লইয়াই "হিন্দু" জাতি গঠিত।

কিন্তু কিছুকাল পরেই তাঁহার মতের সম্পূর্ণ বিপর্য্যয় ঘটিল। তিনি যখন স্যার উপাধি প্রাপ্ত হইলেন এবং আলিগড়ের মুসলমান শিক্ষানিকেতনের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইলেন, তখন স্যার সৈয়দ সেই মুখেই সম্পূর্ণ বিপরীত কথা বলিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ, এতকাল তিনি যেমন জনসাধারণের পক্ষে ছিলেন, এখন হইতে তিনি তেমনি সম্পূর্ণভাবে গবর্ণমেণ্টের পক্ষ অবলম্বন করিলেন এবং তদনুরূপ উক্তি প্রচার করিতে লাগিলেন।

লাজপৎ রায়ের পিতা লালা রাধাকিষেণ স্যার সৈয়দের একজন ভক্ত এবং তাঁহার পুস্তক ও রচনাসমূহের নিয়মিত পাঠক ছিলেন। পিতার নিকট হইতে লাজপৎ রায়ও স্যার সৈয়দকে ভক্তি করিতে শিখিয়াছিলেন এবং তাঁহার লেখা-সমূহের উৎসাহী পাঠক ছিলেন। কিন্তু স্যার সৈয়দকে পরবর্ত্তী জীবনে তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন করিতে দেখিয়া বৃদ্ধ রাধাকিষেণ অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন এবং তাহার তীব্র সমালোচনা করিয়া একটি উর্দ্দু পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতে লাগিলেন। এই প্রবন্ধগুলি পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল।

স্যার সৈয়দ তাঁহার কিরূপ ভক্তির পাত্র ছিলেন এবং তাঁহার লেখা লাজপৎ রায়ের কিরূপ প্রিয় ছিল, তাঁহার নিজের ভাষাতেই উহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। স্যার সৈয়দের সমালোচনা করিতে গিয়া তিনি লিখিয়াছেন,—

"আমি সর্ব্বদা আপনার লেখা পড়িতাম এবং উহার ভক্ত ছিলাম। বাল্যকাল হইতেই আলিগড়ের বৃদ্ধ শ্বেতশ্মশ্রুধারী সৈয়দের মতামত ও শিক্ষাকে আমি শ্রদ্ধা করিতে শিখিয়াছিলাম। আপনার প্রণীত 'সমাজ-সংস্কারক' পুস্তক আমার পিতা আমাকে পড়িয়া শুনাইতেন। তিনিও আপনাকে উনবিংশ শতাব্দির একজন মহৎ উপদেষ্টা মহাপুরুষ বলিয়া মনে করিতেন। 'আলিগড় ইনষ্টিটিউট্ গেজেটে' আপনার লেখা এবং কাউন্সিল ও সভা প্রভৃতিতে আপনার বক্তৃতা আমি সর্ব্বদা পাঠ করিতাম এবং আমার পিতাকর্ত্তৃক ঐ সমস্ত অতি পবিত্র বস্তুরূপে সুরক্ষিত হইত।"

কিন্তু পরবর্ত্তী জীবনে যখন স্যার সৈয়দ তাঁহার মতামতের আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিলেন, তখন লজপৎ রায় প্রাণে অত্যন্ত আঘাত পাইলেন এবং তাঁহার এই মত-পরিবর্ত্তনের নিন্দা না করিয়া পারিলেন না। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে যখন লাজপৎ রায়ের বয়স মাত্র ২৩ বৎসর তখনই তিনি স্যার সৈয়দের মত-পরিবর্ত্তনের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিলেন।

সেই বৎসর লাহোরে প্রথম কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। লাজপৎ রায় পিতার উর্দ্দু ভাষায় লিখিত স্যার সৈয়দের সমালোচনার ইংরেজিতে অনুবাদ করিলেন এবং তৎসহ নিজের তীব্র সমালোচনা যোগ করিয়া তিনি কংগ্রেসে পাঠ করেন।

তাঁহার সেই স্মরণীয় প্রবন্ধের উপসংহার হইতে এখানে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল।—

"এইটুকু নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে যে, হয় আপনার পূর্ব্বের লেখা আপনার স্বরচিত নয়, অথবা আপনার বর্ত্তমান উক্তিসমূহ অন্য কাহারো দ্বারা প্ররোচিত—আপনার নিজের মনের কথা নয়। বেচারা স্যার সৈয়দ! আপনার এই সমস্ত পরস্পর-বিরোধী মতের জন্য আপনি নিশ্চয় দুঃখিত, কিন্তু তাহা মুখ ফুটিয়া বলিবার সাহস আপনার নাই। কিন্তু আপনাকে আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি যে, আপনার নিরাশ হওয়ার কারণ নাই,—স্বদেশের পূজা-বেদির সম্মুখে সামান্য একটু আত্মত্যাগ, আপনার পূর্ব্বের যে মত ছিল তাহাই আবার নূতন করিয়া ব্যক্ত করা,—ইহাই আপনাকে পুনরায় স্বদেশবাসীর বিশ্বাসভাজন হইতে সক্ষম করিবে।... এক বৎসর হইল আপনি জাতীয় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছেন কিন্তু আজ পর্য্যন্ত আপনার দেশবাসী

স্পষ্ট বুঝিতে পারিল না, জাতীয় কংগ্রেসের কোন কার্য্যের আপনি বিরোধী। আপনি বলেন যে, আমরা এখনো গণতন্ত্রের উপযুক্ত নই, আমরাও তাই বলি। আপনি বলেন যে, আমরা এখনো পার্লিয়ামেণ্ট পাওয়ার উপযোগী হই নাই, আমরাও তাহাই বলি। কিন্তু আপনি যদি বলেন যে, গবর্ণমেণ্টের কাজে সর্ব্বসাধারণের নির্ব্বাচিত লোক থাকা দেশের পক্ষে অমঙ্গলকর, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করিতে চাই, কবে কখন কি ভাবে আপনি এই আশ্চর্য্য আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইলেন! কারণ ১৮৮৪ সাল পর্য্যন্ত আপনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, ব্যবস্থাপক সভাসমূহ জন-সাধারণের মনোনীত সভ্যদের লইয়া নূতনভাবে সংঘঠিত হওয়া উচিত।”

১৮৮৮ সালে মাত্র ২৩ বৎসর বয়সে লাজপৎ রায় সর্ব্বপ্রথম কংগ্রেসের ভিতর দিয়া প্রকাশ্যভাবে রাজনীতি-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত কংগ্রেসের সহিত সংযুক্ত থাকিয়া তিনি দেশসেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন।

তিনি প্রথম যৌবনে স্যার সৈয়দের লেখা হইতে প্রেরণা পাইয়াছিলেন, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। স্যার সৈয়দের এই মতগুলি এখন পর্য্যন্ত শিক্ষিত ভারতবাসীর

সাধারণ সম্পত্তি। স্বদেশকে ভালবাসে এরূপ একটি সত্য কলেজের শিক্ষা-সমাপ্ত যুবকের মনে এগুলি যথেষ্ট চিন্তার সৃষ্টি করিয়াছিল। কিন্তু প্রকৃত স্বদেশধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন তিনি গত শতাব্দির ইটালির স্বদেশ-প্রাণ মহাপুরুষদের জীবনচরিত পাঠ করিয়া। তিনি এই সব মহা-পুরুষের জীবন-চরিত পড়িয়া এতদূর মুগ্ধ হইলেন যে, শুধু পড়িয়াই নিরস্ত থাকিতে পারিলেন না,—এই মহাপুরুষদের জীবনের আদর্শ দেশবাসীর সম্মুখে তুলিয়া ধরিবার জন্য ম্যাজিনি ও গ্যারিবাল্‌ডির জীবনী তিনি উর্দ্দূ ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিলেন। এখন পর্য্যন্ত তাঁহার প্রণীত এই-সব পুস্তক পাঞ্জাবে অতি আগ্রহের সহিত পঠিত হইয়া থাকে।

দেশসেবায় উৎসর্গীকৃত স্বদেশের মহাপ্রাণ ব্যক্তিদের প্রতিও তাঁহার তরুণ হৃদয় কম আকৃষ্ট হয় নাই। সমগ্র হিন্দু-জাতিকে সম্মিলিত করিয়া যে স্বদেশভক্ত বীর হিন্দুসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেই শিবাজীর ইতিহাস পড়িয়া তাঁহার প্রতি লালাজীর হৃদয় শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি শিবাজীর একটি সুদীর্ঘ জীবন-চরিত প্রণয়ণ করিলেন। এই পুস্তকখানা যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। ইহা ছাড়া তৎপ্রণীত শ্রীকৃষ্ণ-

চরিত ও তদীয় গুরু স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর জীবনীর এখনো উত্তর-ভারতে বহুল প্রচার রহিয়াছে।

এই সকল মহাপুরুষের জীবনী-পাঠ তাঁহার নিকট ব্যর্থ হয় নাই। প্রকৃত ভক্ত ও সমালোচকের দৃষ্টি দিয়া তিনি এইসব জীবনী পাঠ ও পুস্তক প্রণয়ণ করিয়াছিলেন। তাহার ফলে লাজপৎ রায়ের মত ভাবপ্রবণ হৃদয়ে এক তীব্র একাগ্রতার সৃষ্টি করিয়াছিল। কি বাক্যে, কি লেখায় তাঁহার এই একাগ্রতা সর্ব্বত্র পরিস্ফুট। তাঁহার একাগ্রতা শুধু ভাবের দিক দিয়া নয়—একাগ্রতা তাঁহাকে পরমুহূর্ত্তেই বাস্তব কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া তুলিত। বাক্যে এই একাগ্রতার ভাব প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গেই কর্ম্মে তিনি উহা পরিণত করিতেন। তাই তিনি এমন বিশেষভাবে বাস্তবকর্ম্মী।

তাঁহার এই বাস্তব-কর্ম্মবুদ্ধি, তীক্ষ্ণ ভবিষ্যৎ দৃষ্টি, তীব্র একাগ্রতা ও কর্ম্মে অদম্য-উৎসাহের গুণে অচিরেই তিনি ভারতীয় জনমণ্ডলীর শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইলেন।

বিলাত যাত্রা

ইতিপূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি ১৯০৫ সনের কাঙ্গরার ভূমিকম্পের পর সেখানকার দুঃস্থ লোকদের সাহায্য প্রদানের জন্য লাজপৎ রায় অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন।

লোকসেবা বা যে-কোনো কাজই হউক না কেন, তিনি যখন উহাতে হাত দিতেন, একবারে মাতিয়া উঠিতেন। নিজের সুখসুবিধা, এমন কি স্বাস্থ্যের প্রতিও তাঁহার দৃষ্টি থাকিত না। কয়েক বৎসর ধরিয়াই তিনি শরীরের উপর এইরূপ অত্যাচার করিতেছিলেন ; কিন্তু কাঙ্গরায় সাহায্য প্রদানের পর তাঁহার শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল।

এই সময়ে ভারতীয় রাজনৈতিকগণ স্বদেশের উন্নতি-কামনায় একটি অনিশ্চিত পন্থা অবলম্বন করিলেন। সেই সময় তাঁহাদের এবং গত কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও বহুলোকের এইরূপ ধারণা ছিল যে, ভারতের এই দুঃস্থ পরপদানত অবস্থা ও বৃটিশ আমলাতন্ত্রের অবিচার যদি ইংলণ্ডের জনসাধারণের নিকট বিবৃত করা যায়, তাহা হইলে তাহারা ভারতের মঙ্গলের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিবে এবং পার্লিয়ামেণ্টকে ভারতের প্রতি মঙ্গলহস্ত প্রসারণ করিতে বাধ্য করিবে। যদিও নানাভাবে ঠেকিয়া, দেখিয়া ও শিখিয়া বর্ত্তমান নেতাদের ভিতর এই মনোভাব আর নাই, কিন্তু তখনকার দিনের নেতাদের ইংরাজ জনসাধারণের উপর যথেষ্ট বিশ্বাস ছিল। এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া নেতাগণ ইংলণ্ডে দুই জন কর্ম্মী প্রেরণ করিতে মনস্থ করিলেন। কর্ম্মী মনোনীত হইলেন লাজপৎ রায় ও গোখেল। কারণ এই কাজে ইঁহাদের চেয়ে উপযুক্ততর

ব্যক্তি তখন আর কেহ ছিলেন না। যদিও এই কার্য্যে তাঁহাদের আশা সম্যক সফল হয় নাই, তথাপি ভারতের কিছু উপকার যে হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই,—ইংলণ্ডের এক শ্রেণীর লোকের দৃষ্টি ভারতের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল।

যাহা হউক, লালা লাজপৎ রায় ১৯০৫ সনে প্রথমবার ইউরোপে রওনা হইলেন। তাঁহার শারীরিক স্বাস্থ্য তখন ভগ্ন, কিন্তু কিছু দিন সমুদ্র যাত্রার ফলে তাঁহার শরীর সুস্থ হইয়া উঠিল এবং সম্পূর্ণ কর্ম্মক্ষম ব্যক্তির ন্যায় তিনি ইংলণ্ডে অবতরণ করিলেন।

ইংলণ্ডে তাঁহাকে নানা স্থানে বহু সভাসমিতিতে অসংখ্য শ্রোতার সম্মুখে বহুদিন বক্তৃতা করিতে হইয়াছে। ইংলণ্ডের রাজনৈতিক দল তখন শ্রমিক, গণতান্ত্রিক ও সোসিয়েলিষ্ট বা সাম্যবাদী প্রভৃতি নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। এই সকল বিভিন্ন দলের সম্মুখে লাজপৎ তাঁহার অসামান্য বাগ্মীতা দ্বারা ভারতের দুর্দ্দশার কথা প্রাঞ্জলভাবে বিবৃত করিতেন। তাহাতে ইংলণ্ডের বহুলোক ভারতে আমলাতন্ত্রের অবিচারের কথা জানিতে পায় এবং তাহাদের মনে ভারত সম্বন্ধে ঔৎসুক্য জাগে। ভারতের মঙ্গলকামী ব্যক্তিও ইংলণ্ডে কেহ কেহ ছিলেন, লাজপৎ ও গোখেলের এই প্রচার-কার্য্যে তাঁহারা ভারতের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হন।

ইংলণ্ড হইতে তিনি ইউরোপের কতকগুলি দেশে যান এবং সেখানে কিছুদিন ভ্রমণের পর আমেরিকা যাত্রা করেন। আমেরিকা যাওয়ার তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, এই দ্রুত উন্নতিশীল জাতির বিশাল শিক্ষা-নিকেতনগুলি দর্শন করা ও তাহাদের শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে পর্য্যালোচনা করা। কারণ, আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি লাজপৎ রায় কিরূপ একজন উন্নতি-কামী শিক্ষাবিদ ছিলেন। দয়ানন্দ কলেজের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে সংস্পৃষ্ট ছিলেন। উহার পরিচালকবর্গের মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি তো ছিলেনই, তাহা ছাড়া নিজে এই কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপনা করিতেন। ইহা ছাড়া আরো অনেক বিদ্যালয় পরিচালনায় তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। তাই আমেরিকার শিক্ষাপদ্ধতি স্বচক্ষে দেখিবার জন্য তাঁহার এই ঔৎসুক্য হইয়াছিল। একজন প্রকৃত শিক্ষাবিদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়া তিনি সেখানকার বড় বড় শিক্ষানিকেতনগুলি দর্শন করিয়াছিলেন এবং উহাদের শিক্ষাপদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে অনুধাবন করিয়াছিলেন।

আমেরিকা হইতে তিনি ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসেন এবং সেখানে গোখেলের সহিত আরো কিছুদিন বক্তৃতাদি দিবার পর স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

লাজপৎ রায়ের একাগ্রতা সম্বন্ধে তাঁর পরম শত্রুর মনেও

কোনো দিন সন্দেহের উদ্রেক হয় নাই। একাগ্র হৃদয়ের বিশেষ ধর্ম্ম এই যে, ভাল কিছু দেখিলেই উহা তাহার হৃদয়ে আন্দোলনের সৃষ্টি করিবে—শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে সে তাহা আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিবে। ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণ লাজপৎ রায়ের হৃদয়ে এক বিষয়ে সেই আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছিল। তিনি দেখিয়াছিলেন, ইউরোপে স্বাধীনতার সংগ্রাম কি প্রচণ্ড উগ্র ও কি একাগ্র! আর ভারতে সেই সংগ্রাম—যদি সংগ্রাম তাহাকে বলা যায়,—কি ধীর, মন্থর, আবেগহীন! এই অবস্থা তাঁহার মনে দারুণ বিক্ষোভের সৃষ্টি করে। ১৯০৫ সনে কংগ্রেসের পক্ষ হইতে ইংলেণ্ডে প্রচারিত 'ইণ্ডিয়া' নামক পত্রিকায় তিনি এ বিষয়ে যে-প্রবন্ধ লেখেন উহার তাৎপর্য্য নিম্নে দেওয়া গেল।—

"কোনো স্বদেশভক্ত ভারতবাসীই ইউরোপে ভ্রমণ করিতে আসিয়া এদেশের লোকেদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের জন্য যে কি প্রবল বাসনা, তাহা দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত না হইয়া পারে না। এই বিষয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চত্যে কত বিভিন্নতা। ইউরোপের লোকেরা সর্ব্বদাই তাহাদের রাজনৈতিক দাবীসমূহের জন্য অতি-ব্যগ্র এবং এই সমস্ত দাবীর বিরুদ্ধে কোনো প্রকারের বাধা তাহারা মানিতে নারাজ। গণতান্ত্রিক মনোবৃত্তিই পাশ্চাত্য সভ্যতার

সর্ব্বক্ষেত্রের মূলসূত্র এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইহা তাহাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। গণতান্ত্রিক ইংলণ্ড, রাজতন্ত্র-জার্ম্মেণি, প্রজাতন্ত্র-ফ্রান্স বা স্বেচ্ছাতন্ত্র-রাশিয়া বা অন্য যে-কোনো দেশই হউক না কেন, সর্ব্বদেশেই এই আদর্শ যে, জনসাধারণ দ্বারাই জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য দেশ শাসিত হইবে। সংবাদপত্র বা বক্তৃতামঞ্চ, সর্ব্বক্ষেত্র হইতে এই বাণী উত্থিত হইতেছে—"দূর ক'রে দাও সেই-সব অত্যাচারী স্বেচ্ছাচারীদের যারা গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় বা দেশের উন্নতিতে বাধা দেয় অথবা জনমতকে তাচ্ছিল্য করতে যাদের দুঃসাহস আছে!" ইউরোপে আসিলে এই মনোবৃত্তি যেমন প্রত্যক্ষ করা যায় এমন আর কোথাও নহে।"

স্বদেশী আন্দোলনে লাজপৎ

লাজপৎ রায় আজীবন 'স্বদেশীর' পক্ষপাতী,—শুধু-পক্ষপাতী নন, নিজে একজন তাহার নিষ্ঠাবান অনুষ্ঠাতা। 'বয়কট' ও 'স্বদেশী'কে তিনি একই জিনিষের দুই পিঠ বলিয়া গণ্য করিতেন। 'স্বদেশী' বা স্বদেশজাত দ্রব্যের ব্যবহার, উৎপাদন ও প্রচার, তিনি বাস্তব দেশ-প্রীতি বলিয়া মনে করিতেন।

১৯০৫ সনের বাংলার স্বদেশী-আন্দোলনের প্রবর্ত্তনের ইতিহাস আজ এক-চতুর্থ শতাব্দি পরেও সে-দিনের ঘটনা-রূপেই বাঙালীর হৃদয়ে জাগ্রত রহিয়াছে। এই স্বদেশী-আন্দোলনসম্বন্ধে লাজপৎ রায় ১৯০৫ সনের কাশীর কংগ্রেসের অধিবেশনে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা চিরসত্য। তিনি বলিয়াছিলেন।—

"ব্যক্তিগতভাবে নিজ সম্বন্ধে আমি বলিতে পারি যে, আমি সর্ব্বতোভাবে 'স্বদেশী' এবং গত পঁচিশ বৎসর যাবত—বস্তুতঃ, যতদিন হইতে আমি দেশ-প্রীতি শব্দের অর্থ বুঝিতে পারিয়াছি, আমি এই 'স্বদেশী' আমার জীবনে আচরণ করিয়া আসিতেছি। যদিও আমি বলিতে চাই না যে, যাঁহারা অবাধ বাণিজ্যের পক্ষপাতী তাঁহারা দেশভক্ত হইতে পারেন না,—তবু আমি 'স্বদেশী' ও দেশপ্রীতি একই পদার্থ বলিয়া মনে করি। সে যাহাই হউক, ব্যক্তিগতভাবে আমি স্বদেশী-আন্দোলনকে অতি মহৎ জিনিষ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। আমি ইহাকে আমাদের দেশের দুঃখদৈন্যতা মোচনের একমাত্র উপায় বলিয়া মনে করি। আমি মনে করি, ইহাই আমাদের দেশের মুক্তির পথ। এই 'স্বদেশীর' ভাব ও আচরণ আমাদিগকে ত্যাগী, আত্ম-বিশ্বাসী, আত্মসম্মানপরায়ণ এবং সর্ব্বোপরি পরুষ করিয়া তুলিবে। এই 'স্বদেশী' হইতে

জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে অমরা সেই শিক্ষা পাইতে পারি—কি করিয়া আমাদের অর্থ সম্পদ পরিশ্রম ও উৎসাহ দেশের মঙ্গলতম কার্য্যে নিয়োগ করা যাইতে পারে। আমাদের জাতিতে জাতিতে বহুপ্রকারের বিরোধ থাকা সত্ত্বেও এই "স্বদেশী'ই আমাদিগকে সম্মিলিত করিয়া তুলিতে পারে।... আমার মতে, এই স্বদেশীই সম্মিলিত ভারতের সর্ব্বজন-আচরণীয় ধর্ম্ম হওয়া উচিত। কিন্তু এইসব সত্ত্বেও সত্যিকার বাস্তব 'স্বদেশী'ভক্তরূপে আমি মনে করি যে, এজন্য দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা উত্তমরূপে পর্য্যালোচনা করা প্রয়োজন এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিল্পোন্নতির চেষ্টা হওয়া উচিত।"

১৯০৭ সনের ডিসেম্বর মাসে সুরাটে নিখিল ভারতীয় স্বদেশী-সম্মিলনীর অধিবেশন হয়। সেই অধিবেশনে 'স্বদেশী' সম্বন্ধে লাজপৎরায় বক্তৃতা দিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন নিম্নে উহার তাৎপর্য্য দেওয়া হইল।—

"জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে 'স্বদেশী'র প্রচার না করিলে এই আন্দোলনের যথেষ্ট উন্নতি হইবে না। জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে এই 'স্বদেশীর' মনোভাব জাগ্রত থাকা উচিত,—শুধু এইটুকু মনে রাখিতে হইবে যে, দেশের উন্নতি ও সম্পদ বৃদ্ধি করিবার জন্য ইউরোপ হইতে যাহা শিখিবার প্রয়োজন তাহা শিখিতে লজ্জিত হইবার কারণ নাই। পশ্চাৎ দিকে ফিরিয়া যাইয়া

কোনো লাভ নাই,—শুধু জাতীয় উন্নতির জন্যই পশ্চাৎদিকে ফিরিয়া যাওয়া চলে, তাহা না হইলে উহা আত্মসংহারক হইবে। পশ্চিমের উন্নত সভ্যতার ছোঁয়াচ এ দেশে না লাগিয়াই পারে না। বর্ত্তমান যুগে আধুনিক অবস্থার ভিতর দিয়াই জাতীয় যুদ্ধে অগ্রসর হইতে হইবে এবং আমাদের বিরুদ্ধে যে-সব অস্ত্র ব্যবহৃত হইয়াছে সেই-সব অস্ত্রই আমাদিগকে এখন অপরের বিরুদ্ধে ব্যবহার করিতে হইবে।”

নির্ব্বাসন

লাজপৎ রায় বিদ্রোহবাদী কিনা, এই প্রশ্ন ১৯০৭ সনে ভারতবাসী ইংরেজদের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়াছিল। কিন্তু লাজপৎ রায় কি সত্যই বিদ্রোহবাদী ছিলেন? তিনি যে-ভাবে কাজ করিয়া আসিয়াছেন এবং যেরূপ প্রচুর বুদ্ধি-শক্তি ও ভারতবর্ষের বাস্তব অবস্থার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল, তাহাতে তাঁহার পক্ষে বিদ্রোহবাদী হওয়া অসম্ভব। মিথ্যা ভড়ং বা যাহা অসম্ভব, এমন কিছুর স্থান তাঁহার হৃদয়ে ছিল না। কিন্তু সমালোচনা বা প্রতিবাদ করিবার কিছু থাকিলে তিনি তাহা তীব্র ভাবেই করিতেন—তাহা দেশের

লোকের বিরুদ্ধেই হউক বা গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধেই হউক। নিজে যেমন আত্মত্যাগী ব্যক্তি ছিলেন, তেমনি তিনি ইচ্ছা করিতেন দেশের লোকও আত্মত্যাগী হউক। ষড়যন্ত্র বা বিদ্রোহপন্থাকে তিনি ঘৃণা করিতেন এবং সে-কথা বহুবার নিজ মুখেই ব্যক্ত করিয়াছেন।

এই সময়ে গবর্ণমেণ্ট ও ভারতীয় ইংরেজেরা "সাম্রাজ্য-দিবস" আন্দোলন উপস্থিত করিয়া ভারতবাসীর নিকট হইতে রাজভক্তির অঞ্জলি পাইবার জন্য সচেষ্ট হইয়া উঠেন। এই আন্দোলনের দ্বারা ইংরেজেরা নিজেদের মনের অসরলতাই প্রকাশ করিতেছে,—লাজপৎ রায় তাহাই মনে করিতেন। তিনি মনে করিতেন, ইংরেজেরা ভারতবাসীকে এক অসম্ভব কাজ করিতে বলিতেছে। কি করিয়া এক বিদেশীকর্ত্তৃক শাসিত পদানত জাতি সেই বিদেশী শাসকদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করিতে পারে, তাহা লাজপৎ রায়ের সরল হৃদয় বুঝিতে অক্ষম ছিল। তিনি মনে করিতেন, বিদেশী শাসকের প্রতি ভক্তি এবং স্বদেশপ্রীতি, এই দুইটি বস্তু সম্পূর্ণভাবে পরস্পর-বিরোধী।

লাজপৎ রায় এই সমস্ত মত অকপট হৃদয়ে পরিস্ফুট-ভাবে ব্যক্ত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তাহা পড়িয়া ভারত-প্রবাসী ইংরেজদের গাত্রজ্বালা উপস্থিত হইল এবং তাহাদের

দ্বারা চালিত নানা পত্রিকায় লাজপৎ রায় বিদ্রোহবাদী,—এই কথা নানাভাবে অতি জোরের সহিত প্রচার করিতে লাগিল। সকলেই জানেন, গবর্ণমেণ্টের আমলাদের মতামত গঠন করিতে এই সমস্ত ইংরেজ-চালিত সংবাদপত্রগুলির ক্ষমতা কি সুপ্রচুর। ইহারা গবর্ণমেণ্টকে বে-আইনী কাজ করিতে উদ্বুদ্ধ করিতে লাগিল।

গবর্ণমেণ্ট বা ইংরেজদের দৃষ্টি বহুদিন হইতেই লাজপৎ রায়ের উপর ন্যস্ত ছিল। ১৯০৫ সনে স্বদেশী-আন্দোলন প্রবর্ত্তনের পর হইতে ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন এক নব বলে বলীয়ান হইয়া দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতে থাকে কিন্তু তাহারও পূর্ব্বে ১৮৯৭ সনে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার হিরক-জুবিলির সময় পাঞ্জাবে একটি ঘটনা ঘটে যাহা লাজপৎ রায়েরই উপযুক্ত। সেই জুবিলি উপলক্ষে পাঞ্জাবের সরকারী কর্ম্মচারী ও তাহাদের ভক্তগণ এই ঘটনা চিরস্মরণীয় করিবার জন্য ভিক্টোরিয়ার একটি প্রস্তরমূর্ত্তি স্থাপন করিতে প্রয়াসী হন। কিন্তু লাজপৎ রায় বলিলেন,—তাহা না করিয়া একটি অনাথ-আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হউক। কি ভাবে এই জুবিলির স্মৃতি রক্ষিত হইবে তাহা স্থির করিবার জন্য একটি সভা আহুত হইল। সেই সভায় লাজপৎ রায়ের মতাবলম্বী লোকের অতি-প্রাচুর্য্য দেখিয়া সরকারী কর্ম্মচারী

ও তাহাদের ভক্তেরা মানে মানে তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িল এবং পরে এক গুপ্তসভা করিয়া প্রস্তরমূর্ত্তি স্থাপনের প্রস্তাব অনুমোদন করাইয়া লইল। কিন্তু লাজপৎ রায় ইহাতে ব্যর্থ হইয়া দমিলেন না,—তিনি জনসাধারণের নিকট হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া একটি অনাথ-আশ্রম স্থাপন করিলেন।

যাহাহউক, বহুদিন হইতেই সরকারী আমলাদের দৃষ্টি লাজপৎ রায়ের উপর ন্যস্ত ছিল, ১৯০৭ সনে সেই দৃষ্টি পৌরাণিক ব্রাহ্মণের দৃষ্টিশক্তির প্রখরতা লইয়া তাঁহাকে ভস্ম করিতে উদ্যত হইল।

সেই সময়ের পাঞ্জাবে লাটসাহেব ছিলেন স্যার ডেন্‌জিল ইবেট্‌সন্। তাঁহার একটু পরিচয় এখানে দেওয়া প্রয়োজন মনে করি। তিনি একজন জবরদস্ত্ হাকিম ছিলেন। পাঞ্জাবে তিনি যখন ডেপুটি কমিশনার ছিলেন, তখন একজন 'স্টেটিউটারি সিভিলিয়ান' অর্থাৎ সেকালের ভারতবর্ষ হইতে গৃহীত ম্যাজিষ্ট্রেট, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে তিনি তাঁহার সহিত দেখা করিতে অস্বীকৃত হইলেন, এই কারণে যে, বেচারা পাদুকা পরিত্যাগ না করিয়া হুজুরে সন্নিধানে উপস্থিত হইয়াছিলেন! তাঁহার লাট-সাহেব হওয়ার অল্পদিন পূর্ব্বে তিনি একটি পাঞ্জাবী ভদ্রলোককে বলিয়াছিলেন, "আমি যখন পাঞ্জাবে যাব তখন 'বাবু'দেরে দেখে নেব।"

সকলেই জানেন 'বাবু' শব্দের অর্থ, ইংরাজদের অভিধানে এদেশীয় শিক্ষিত ভদ্রলোক।

স্যার ডেন্‌জিল ইবেট্‌সন সেই সুযোগের অপেক্ষায় রহিলেন। সুযোগও শীঘ্রই আসিল। এই সময়ে পাঞ্জাবে কৃষকের অত্যন্ত ক্ষতিকর এক আইনের প্রবর্ত্তন হইতেছিল। ইহাতে পাঞ্জাবীরা তীব্র আন্দোলনের সৃষ্টি করিল। পাঞ্জাবের সকল শিক্ষিত লোকেরা এই আন্দোলনে কৃষকদের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। রাওলপিণ্ডিতে তাঁহারা নানা প্রকার সভা-সমিতি করিতে লাগিলেন। কিন্তু সর্ব্বত্র তাঁহারা নিরুপদ্রব ছিলেন। লাজপৎ ইহার এক সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং সেখানে ডেপুটি কমিশনারের সহিত কিঞ্চিত 'উষ্ণ বাক্যের' আদান-প্রদানও হয়।

এই আন্দোলনে রাওলপিণ্ডির প্রধান আইনোপজীবিগণ যোগ দিয়াছিলেন। কিছু দিন পরে এই আন্দোলনের বেগ কমিয়া আসিলে লাজপৎ রায় লাহোরে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু অবিলম্বে রাওলপিণ্ডির নেতারা গ্রেপ্তার হইয়া কারাগারে আবদ্ধ হইলেন। সুদীর্ঘ বিচারের পর হাইকোর্ট সকলকে নির্দ্দোষ বলিয়া মুক্তি দিলেন।

লাজপৎ রায়কে এই দলের সহিত ধৃত করা হয় নাই; হইলে তিনিও নিশ্চয় মুক্তি পাইতেন। কিন্তু ডেপুটি

কমিশনার বা রাওলপিণ্ডির ম্যাজিষ্ট্রেট এমন কোনো অপরাধই পাইলেন না, যাহা লাজপৎ রায়ের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

কিন্তু অপরাধ না পাইলে কি হইবে ?—প্রকাশ্য আদালতে না লইয়া যাইয়াও তো 'বাবু'দিগকে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে—সে বঙ্গেই হউক কি পাঞ্জাবেই হউক! তাহা না হইলে ১৮১৮ সনের তিন আইন আছে কি জন্য! এই বে-আইনী আইনের জোরেই বাংলাদেশে সুভাষ বসু প্রমুখ শত শত দেশসেবককে নির্য্যাতিত করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের ১৯২৮ সনের ডিসেম্বর মাসের মডার্ণ রিভিউর প্রবন্ধের ভাষায় বলা যায়,—সকল উৎকৃষ্ট গবর্ণমেণ্টেরই বিনা অজুহাতে গ্রেপ্তার ও বিনা-বিচারে কারারুদ্ধ করিবার ক্ষমতা থাকা উচিত। ফ্রান্সের বুরবোঁদের রাজত্বকালে এইরূপ আইন ছিল না? আর রাশিয়ার জার?—সেও কি শত শত নরনারীকে বিনা-বিচারে সাইবেরিয়ায় পাঠায় নাই? বুরবোঁরা গিয়াছে, জাররা গিয়াছে,—কিন্তু তাহাতে কি?—১৮১৮সনের তিন-আইন ভারতে তেমনি অচল অক্ষয় হইয়া দাঁড়াইয়া আছে!

লাজপৎ রায়কে এই আইন অনুসারে গ্রেপ্তার করা হইল। তারপর সেই মান্দালয়!—যেখানে সুভাষ বসু

প্রমুখ কর্ম্মীরা ঠিক এই আইন অনুসারে গ্রেপ্তার হইয়া প্রায় তিন বৎসর পচিয়া আসিয়াছেন। লাজপৎ রায়ের তখনকার ভাগ্য ভাল ছিল বলিতে হইবে, কেননা মাত্র ছয় মাস পরেই তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হইল লাজপৎ রায়ের এই গ্রেপ্তার ও মুক্তি পূরাদস্তুর নাটকীয়ভাবে হইয়াছিল। একদিন অপরাহ্নে তাঁহাকে লাহোরে গ্রেপ্তার করা হইল; তারপর তাঁহাকে লইয়া যে কোথায় রাখা হইল বা কি করা হইল, এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে কোনো সংবাদই আর পাওয়া গেল না। তারপরে হঠাৎ একদিন খবর বাহির হইল, তাঁহাকে মান্দালয় জেলে রাখা হইয়াছে। তাঁহার মুক্তি সম্বন্ধেও সেইরূপ নাটকের অভিনয়,—কোনো খবর নাই,—হঠাৎ একদিন অতি প্রত্যুষে কেহ ঘুম হইতে উঠিবার আগে তাঁহাকে লাহোরে নিজের বাড়ীর দরজার সম্মুখে আনিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল।

এই নির্ব্বাসনের পূর্ব্বেই লাজপৎ রায় যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন কিন্তু এই ঘটনার পর তিনি দেশের প্রসিদ্ধতম ব্যাক্তিদের এক জন হইয়া পড়িলেন। যেখানেই যাইতেন, তাঁহাকে অন্তরের শ্রদ্ধা-জ্ঞাপনের জন্য লোকেরা ব্যাকুল হইয়া উঠিত। এ বিষয়ে একটি উল্লেখযোগ্য ক্ষুদ্র ঘটনা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত তাঁহার 'মডার্ণ রিভিউর' প্রবন্ধে

বিকৃত করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, 'আমি তখন এলাহাবাদে। প্রচারিত হইল যে, লাজপৎ রায় এখানে শীঘ্রই বক্তৃতা করিতে আসিবেন। আমি যেখানে থাকিতাম উহার নিকটেই একদল পাঞ্জাবী ঘোড়-সোয়ার অবস্থান করিতেছিল। একদিন বিকালে ইহাদের কয়েকজনের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। তাহারা বলিল যে, তাহারা রেলওয়ে ষ্টেশনে লাজপৎ রায়কে অভ্যর্থনা করিতে যাইবে। আমি বলিলাম, তাহারা ছুটি পাইবে না। ইহাতে তাহারা উত্তর করিল যে, ছুটি না পা'ক বা চাকরী যা'ক, তাহার জন্য তাহারা চিন্তিত নয়। তখন আমি তাহাদিগকে এই বলিয়া নিবৃত্ত করিলাম যে, ইহাতে লাজপত রায়ের উপর গবর্ণমেণ্টের সন্দেহ পড়িতে পারে। তথাপি অনেকে নানা সভায় এবং অন্যত্র লাজপৎ রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছে।'

স্যার মাইকেল ওডায়ার পাঞ্জাবের গবর্ণর না থাকিলে যেমন জালিয়ানালা বাগের মর্ম্মন্তুদ ঘটনা ঘটিত না ; তেমনি ইহাও নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে যে, স্যার ডেন্‌জিল ইবেট্‌সন্‌ তখন পাঞ্জাবের লাটসাহেব না থাকিলে লাজপৎ রায় নির্ব্বাসিত হইতেন না। এই সমস্ত ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিরা তাঁহাদের ক্ষুদ্র দৃষ্টি ও উগ্রতা দ্বারা যে-বিষবীজ রোপন

করিয়া থাকেন তাহার ফল কল্পনা করিতে ইঁহারা অক্ষম। ইঁহারাই ভারতে ব্রিটিশ শাসনের পরম শত্রু।

দ্বিতীয়বার আমেরিকা ভ্রমণ

১৯০৫ সনে প্রথমবার তিনি আমেরিকা গিয়া মাত্র তিন সপ্তাহ সেখানে থাকিতে পারিয়াছিলেন। বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ মিশনের চেষ্টার ফলে সেদেশের এক শ্রেণীর লোক ভারতের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। প্রথম বার সেখানে যাইয়া লাজপৎ রায় দেখিয়া আসিয়াছিলেন, সেদেশে যেমন বহু জিনিষ শিখিবার আছে, তেমনি সেদেশের লোকেদেরে ভারতের প্রকৃত অবস্থা বুঝাইয়া দিবার প্রয়োজনীয়তাও যথেষ্ট রহিয়াছে। দ্বিতীয় বার আমেরিকা যাইয়া তিনি প্রধানতঃ এই কাজে ব্যাপৃত হইলেন। তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়া পাশ্চিমের প্রতিষ্ঠানসমূহ পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন—এই উদ্দেশ্য লইয়া যে, যাহা-কিছু সেদেশে ভাল তাহা যেন ভারতবর্ষে প্রবর্ত্তন করা যায়। অপরদিকে ভারতের আশা আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধ ও পুস্তিকাদি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহার 'ইয়ং ইণ্ডিয়া নামক' কাগজ সেদেশে বহুলভাবে প্রচারিত হইয়াছিল এবং 'ইণ্ডিয়া বুরো' নামে একটি সমিতি তিনি স্থাপন করিলেন। এই

সমিতি হইতে ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীদের সম্বন্ধে সকল জ্ঞাতব্য বিষয় সঠিকভাবে আমেরিকায় প্রকাশিত হইতে লাগিল।

এই সময়ে ১৯১৪ সনে ইউরোপে মহাসমর আরম্ভ হইল। লাজপৎ রায় তখন বিদেশে। কিন্তু তিনি যখন শুনিলেন, ভারতবাসীকে সৈন্যদলে ভর্ত্তি করিয়া ইউরোপে প্রেরণ করা হইবে বলিয়া গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন, তখন তাঁহার পাঞ্জাবী বীররক্ত নাচিয়া উঠিল। তিনি গবর্ণমেণ্টের এই কাজের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া প্রবন্ধাদি লিখিতে লাগিলেন।

কিন্তু ভারত-গবর্ণমেণ্টের লাজপৎরায়ের উপর রোষ কোনো দিনই হ্রাস পায় নাই। এমন কি আমেরিকায় তিনি ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে যে প্রচার-কার্য্য করিয়াছিলেন তাহাও গবর্ণমেণ্টের বিষদৃষ্টিই আকর্ষণ করিয়াছিল। ফলে তাঁহার ভারতবর্ষে আসা নিষিদ্ধ হইয়া গেল—তিনি বিদেশেই বাস করিতে বাধ্য হইলেন।

ভারতবর্ষে আসিবার জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের অনুমতি মিলিল না। বিক্ষুব্ধচিত্তে বিদেশেই অবস্থান করা ছাড়া তাঁহার আর গত্যান্তর ছিল না।

দেশের দুরবস্থা, জালিয়ানালা বাগের ঘটনা এবং

দুর্ভিক্ষের সংবাদ তাঁহার নিকট পৌঁছিতে লাগিল আর তিনি শৃঙ্খলাবদ্ধ সিংহের ন্যায় দুঃখে ম্রিয়মান হইয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন। তিনি তখন স্বদেশে ফিরিবার জন্য কিরূপ আকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার ১৯১৯সনের আগষ্ট মাসের 'ইয়ং ইণ্ডিয়ায়' প্রকাশিত প্রবন্ধ হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়। তিনি উহাতে যাহা বলিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য এইরূপ,—

"আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে আমাকে স্বদেশে ফিরিতে দেওয়া হইতেছে না, বিশেষতঃ এই সময়ে যখন আমি ভারতে যাইবার জন্য অতিশয় ব্যগ্র হইয়াছি। ভারতবর্ষে এখন ভীষণ দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইয়াছে এবং তাহার অন্যান্য অবস্থাও অত্যন্ত সঙ্কটজনক। গত পঁচিশ বৎসর ব্যাপিয়া আমি দুর্ভিক্ষে সাহায্যকার্য্যে নিজেকে নিয়োগ করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু এখন এই অবস্থাতেও আমি আমার লোকেদের কোনো সাহায্যই করিতে পারিতেছি না দেখিয়া আমার হৃদয় ব্যথিত হইতেছে।

"ভারত এখন দ্রুত গতিতে এমন অবস্থার দিকে চলিয়াছে যে, যাহারা স্বদেশকে ভালবাসে তাঁহারা নিশ্চয়ই অনুভব করিবে, এখন তাহাদের স্থান হওয়া উচিত স্বদেশে আপন দেশবাসীর মধ্যে—এইরূপ বিদেশে নিরাপদে আরামে

নয়।...আমার দেশবাসীরা এখন যে বিপুল বিরুদ্ধ অবস্থার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে আমি তাহাতে যোগ দিতে পারিতেছি না বলিয়া নিজেকে অপরাধী মনে করিতেছি। যদিও জানি, এই অপরাধ আমার ইচ্ছাকৃত নয়, তবু সেই চিন্তায় আমি আর সান্ত্বনা পাইতেছি না। মানি আমি যে, বিদেশীদের মনে ভারতবর্ষে স্বরাজপ্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে অনুকূল মত সৃষ্টি করিয়া তোলা ভাল কাজ কিন্তু সমগ্র পৃথিবীর অনুকূল মত বা অনুমোদনও আমাদিগকে পূর্ণভাবে সাহায্য করিতে পারে না। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ভারতবাসীদের দ্বারা ভারতবর্ষেই অর্জ্জন করিতে হইবে। এমন কি যদি কেহ তাহার স্বকীয় মতের জন্য নির্য্যাতন ভোগ করে তাহাও তাহার ভারতবর্ষেই করা উচিত। এই মহাসমর পৃথিবীকে মুক্তি দিবার জন্য সংসাধিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহার প্রথম ফল এই হইয়াছে যে, যে-সমস্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ জাতিকে পৃথিবীতে গণতন্ত্র স্থাপনের জন্য এই মহাযুদ্ধে যোগ দিতে প্ররোচিত করা হইয়াছিল, তাহাদের পরাধীনতা-শৃঙ্খল আরো কঠোরতর হইয়াছে। শাসক জাতিরা কি ইহাতে কিছুই শিক্ষালাভ করিবে না?"

অবশেষে লাজপৎ রায়ের ইংরেজ বন্ধুদের চেষ্টার ফলে গবর্ণমেণ্ট সম্মত হইলেন এবং তাঁহাকে ভারতবর্ষে

প্রত্যাবর্ত্তনের অনুমতি দেওয়া হইল। তাঁহার আমেরিকা পরিত্যাগের পূর্ব্বে ১৯১৯ সনের ২৮শে নভেম্বর নিউইয়র্কে এক ভোজের আয়োজন হয়। সেই উপলক্ষে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি তাঁহার মনোভাব কিরূপ তাহা ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তিনি যে স্বপ্ন-বিলাসী ছিলেন না বরং বাস্তব অবস্থার প্রতি তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল তাহাও এই বক্তৃতায় তিনি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন। এখানে তাহা উদ্ধৃত হইল।—

"আমি আমার জীবনের অপরাহ্ণে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। কিন্তু যৌবন-সুরা যখন আমার ধমনীতে প্রবাহিত ছিল তখনো আমি কেবল কল্পনা, বড় বড় কথা বা স্বপ্নদ্বারা মোহিত হই নাই। গ্রেটব্রিটেনের শক্তি কতখানি তাহা আমি সম্পূর্ণভাবে জানি এবং আমাদের বর্ত্তমান অসহায় অবস্থায় সেই শক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া যে কতখানি অসম্ভব তাহাও আমার অজ্ঞাত নয়। প্রকৃত অবস্থা যাহা তাহা মানিতেই হইবে। যুদ্ধ আমি পছন্দ করি না—রক্তপাত আমার ঘৃণার উদ্রেক করে। ব্যক্তিগতভাবে ব্রিটিশ-চরিত্রের প্রতি আমার প্রচুর শ্রদ্ধা আছে—তাঁহাদের ভিতর আমার অনেক বন্ধু-ব্যক্তি আছেন। আমার নিজের কথা এই বলিতে পারি যে, ব্রিটিশ কমনওয়েল্‌থের অন্তর্গত ক্যানাডা বা দক্ষিণ

আফ্রিকার মত গণতান্ত্রিক সমানাধিকার যদি ভারতবর্ষকে দেওয়া হয় তাহা হইলেই আমি সন্তুষ্ট।”

নন্-কো-অপারেশনে লাজপৎ

প্রায় আট বৎসর বিদেশে বাস করিয়া ১৯২০ সনের ২০শে ফেব্রুয়ারী তিনি বোম্বাই সহরে অবতরণ করিলেন। সকল শ্রেণীর লোকেরা তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা করিয়া গ্রহণ করিল। যেখানেই তিনি গিয়াছেন সেখানেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মান তিনি লাভ করিতেন।

তাঁহার বিদেশে থাকিবার সময়ই মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড-প্রবর্ত্তিত ভারতের ‘রিফর্ম’-গবর্ণমেণ্টের পদ্ধতি প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি তখন আমেরিকা হইতে মনে করিয়াছিলেন যে, এই পদ্ধতিতে ভারতের রাজনৈতিক অধিকার কতকটা লাভ করা হইল। কার্য্যক্ষেত্রে যে রিফর্ম-গবর্ণমেণ্টের মূল্য কিছুই নাই তাহা তিনি কল্পনা করেন নাই। তাই ইহা সরল মনে সমর্থন করিয়া নিজের মত নিঃসঙ্কোচে ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

কিন্তু দেশে আসিয়া জালিয়ানালাবাগের মর্ম্মন্তুদ ঘটনা যতই আলোচনা করিতে লাগিলেন ততই তাঁহার হৃদয় জ্বলিয়া উঠিয়া দারুণ বিক্ষোভের সৃষ্টি করিতে লাগিল। সমগ্র

দেশ জালিয়ানালাবাগের হত্যাকাণ্ডে ক্ষুব্ধ মর্ম্মাহত হইয়া উঠিয়াছিল। এই হত্যাকাণ্ডের উদ্যোক্তাদের কার্য্যের তদন্তের জন্য হাণ্টার-কমিটি বসিল। কিন্তু সেই কমিটির তদন্তের ফল যে আশঙ্কানুরূপই হইয়াছিল—অর্থাৎ এরূপ ক্ষেত্রে যাহা স্বাভাবিক তাহাই হইয়াছিল, সে কথা দেশবাসীর হৃদয় হইতে কখনো মুছিবার নয়। এই হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত বিচার কিছুই হইল না। সমগ্র দেশবাসীর ন্যায় লাজপৎ রায়ও ইহাতে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন। রিফর্ম-গবর্ণমেণ্টের মরীচিকা তাঁহার মন হইতে অপসৃত হইয়া গেল।—তিনি বুঝিলেন, এই জালিয়ানালাবাগের হত্যাকাণ্ডের যাহারা উদ্যোক্তা তাহাদের সহিত একযোগে কাজ করা যে সম্পূর্ণভাবে অসম্ভব!

এই সময় মহাত্মা গান্ধী তাঁহার নন-কো-অপারেশন বা অসহযোগ আন্দোলনের সৃষ্টি করেন। লাজপৎ রায় স্থির করিলেন, যতদিন না এই হত্যাকাণ্ডের সুবিচার হয় ততদিন তিনি দৃঢ়ভাবে এই অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনা করিবেন। বলা বাহুল্য, পাঞ্জাবের সেই হত্যাকাণ্ডের বিচার হয় নাই; লাজপৎ রায়ও অসহযোগ আন্দোলন ত্যাগ করিলেন না।

১৯২০সনের জুনমাসে তাঁহার স্বকীয় ‘বন্দেমাতরম’

পত্রিকায় তিনি একটি প্রবন্ধ লিখিয়া দেশবাসী ও গবর্ণমেণ্টকে পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়া দিলেন—কেন রিফর্ম-কাউন্সিলে যোগ দেওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। নিম্নে তাহার তাৎপর্য্য দেওয়া হইল,—

"হাণ্টার কমিটির রিপোর্টের উপর গবর্ণমেণ্ট যে নির্দ্ধারণ করিয়াছেন তাহাতে এই বুঝা যায়—স্যার মাইকেল ও'ডায়ারের পাঞ্জাবের নীতি দোষের হয় নাই। ইহার অর্থ এই যে দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় ও'ডায়ারের বিরুদ্ধে যে-সব অপরাধ আরোপ করিতেছে তাহা অর্থহীন ও ভিত্তিহীন। আমার মতে গবর্ণমেণ্টের এই নির্দ্ধারণে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের গবর্ণমেণ্টের সহিত এক যোগে কাজ করা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। স্যার মাইকেল পাঞ্জাবের শিক্ষিত সম্প্রদায়কে ঘৃণার চোখে দেখিতেন।......

পাঞ্জাবের সেই সামরিক আইনের দিনে যাহারা শিক্ষিত সম্প্রদায়কে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করিবার কর্ম্মকর্ত্তা ছিল তাহারা এখনো নিজ নিজ সিংহাসন উজ্জ্বল করিয়া সগৌরবে অধিষ্ঠান করিতেছে। কর্ণেল ও'ব্রায়ন, যে গুজরনালার উকিলদের উপর অকথ্য অত্যাচার করিয়াছিল; মেজর বসওয়ার্থ স্মিথ, যে নিজের যষ্টিদ্বারা ভারতীয় নারীদের অবগুণ্ঠন তুলিয়া ফেলিয়া অত্যন্ত কুৎসিতভাবে তাঁহাদের

সহিত কথা কহিয়াছিল,—এখনো তাহারা স্ব স্ব পদে প্রতিষ্ঠিত।......

পাঞ্জাবের ব্যবস্থাপক সভায় এইসব লোকেরা সরকারী সভ্যরূপে আগমন করিবে। ব্যক্তিগতভাবে ইহাদের প্রতি আমার কোনো শত্রুতা নাই, ব্যক্তিগতভাবে ইহাদের হাতে আমি লাঞ্ছিতও হই নাই! কিন্তু কাউনন্সিলের যে-কোনে ভারতীয় সভ্যকে এইসব লোকেদের সহিত মিশিতে হইবে। বিশেতেঃ যদি কাউন্‌সিলে যাইয়া কাজ করিবার ইচ্ছা থাকে তবে ইহাদের সহিত না মিশিয়া উপায় নাই।......কিন্তু সামরিক আইন পাঞ্জাবের দেহে যেসমস্ত ক্ষত সৃষ্টি করিয়াছে তাহা শুষ্ক হওয়া তো দূরের কথা, এখনো সেগুলি এতই কাঁচা যে আমি নিজেকে কাউন্‌সিলে যোগ দেওয়ার অযোগ্য মনে করি। আমার হৃদয় একেবারে ভাঙিয়া গিয়াছে—এই বিক্ষত হৃদয় লইয়া আমি কাউন্‌সিলে যাইতে অক্ষম। যদিচ ব্যক্তিগতভাবে আমি অত্যাচার ভোগ করি নাই কিন্তু আমার আত্মসম্মান বজায় রাখিয়া এই সব লোকেদের সহিত—যাহারা আমার ভাইদিগকে বেত্রাঘাত ও অন্যান্য শত প্রকারে লাঞ্ছিত করিয়াছে, মেলামেশা করা অসম্ভব।......'সিভিল ও মিলিটারি গেজেটে' পাঞ্জাবের ইউরোপীয় কর্ম্মচারীদের মতগুলি যদি ঠিকভাবেই বর্ণিত

হইয়া থাকে তবে আমি নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি যে দেশের মঙ্গলের জন্য ভারতবাসী ও ইউরোপীয়দের এক যোগে কাজ করিবার দিন এখনো আসে নাই। আমি কামনা করি সেইদিন আসুক, কিন্তু যদি কেহ বলে যে সেইদিন আসিয়াছে তবে বলিতে হইবে যে সত্যিকার অবস্থার প্রতি তাহার দৃষ্টি নাই। এখন পর্য্যন্তও উহারাই শাসক আর আমরা শাসিত। গবর্ণমেণ্টের বিশ্বাসভাজন পাঞ্জাব পাব্লিসিটি কমিটিও তাহাই বলে। যতদিন পর্য্যন্ত এই সম্পর্ক চলিবে ততদিন উভয়ের একযোগে কাজ করা দুঃসাধ্য। তাহারা আমাদিগকে অবিশ্বাস করে—আমরা তাহাদিগকে অবিশ্বাস করি।"......

এই সময় হইতে তিনি দশের কাজে সম্পূর্ণভাবে আত্ম-নিয়োগ করিয়া মাতিয়া উঠিলেন। আট বৎসর বিদেশে থাকিতে বাধ্য হইয়া তাঁহার ভিতর যে প্রচণ্ড কর্ম্মশক্তি সঞ্চিত হইতেছিল, এই বার তিনি সেই শক্তিকে বাস্তব কার্য্যে নিয়োগ করিতে সমর্থ হইলেন। এই সময় হইতে তাঁহার রাজনৈতিক কার্য্যের তালিকা সংক্ষেপে বিবৃত করা অসম্ভব। ১৯২০ সনের এপ্রিল মাসে তিনি পাঞ্জাব প্রাদেশিক সম্মিলনীতে জালিয়ানালাবাগ-স্মৃতি-ভাণ্ডারে অর্থসাহায্যের জন্য অতি তীব্র ভাষায় এক বক্তৃতা দেন। ১লা আগষ্ট

লোকমান্য তিলক স্বর্গারোহণ করেন। তখন তিনি মডারেট-দিগকে কলিকাতা কংগ্রেসে যোগ দিবার জন্য অনুরোধ করিয়া এক আবেদন প্রকাশ করেন। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনবিষয়ে আলোচনা করিবার জন্য ৪ঠা সেপ্টম্বর কলিকাতায় কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশন হয়। সেই অধিবেশনে লাজপৎ রায় সভাপতির কার্য্য করেন।

১৯২১ সালে মহাত্মার এই অসহযোগ-নীতি সমগ্র দেশ ব্যাপিয়া এক অতি প্রবল আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়া তুলিল। সেই সময় দেশবন্ধু ও পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু প্রভৃতি কত নেতা ও স্বেচ্ছাসেবককে যে কারাবরণ করিতে হইয়াছে তাহার ইতিহাস দেশবাসী কখনো ভুলিতে পারিবে না। গবর্ণমেণ্ট এই আন্দোলনকে বিনাশ করিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। সভা করা বা স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ নিষিদ্ধ হইয়া গেল। দেশময় তখন প্রবল উত্তেজনা। ইহার উপর যুবরাজের ভারতাগমণ এই উত্তেজনায় ঘৃতাহুতি প্রদান করিল। সমগ্র দেশ যুবরাজকে বয়কট ও তাঁহার আগমনউপলক্ষে হরতাল করিতে লাগিল।

সমগ্র দেশের ন্যায় পাঞ্জাবেও এই উত্তেজনা প্রবল রূপ ধারণ করিয়াছিল। সেখানেও জনসাধারণের প্রকাশ্য সভা

করা নিষিদ্ধ হইয়া গেল। কিন্তু লাজপৎ রায় পাঞ্জাব প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির একটি সভা আহ্বান করিলেন। এই সভা জনসাধারণের প্রকাশ্য সভা ছিল না—শুধু কংগ্রেস কমিটির চল্লিশজন সভ্য এই সভায় যোগ দিয়াছিলেন। কিন্তু তথাপি তাঁহারা বিপদের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। লাজপৎ রায় সভাপতি হইলেন। এদিকে সশস্ত্র পুলিশ আসিয়া সেই বাড়ী ঘেরাও করিয়া ফেলিল। কর্ণেল গ্রেগ্‌সন্ দরজায় দাঁড়াইয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ পাঠ করিয়া জানাইলেন যে, এই সভা বে-আইনী।

শুনিয়া লাজপৎ রায় সভ্যদিগকে বলিলেন, যাঁহারা ইচ্ছা করেন চলিয়া যাইতে পারেন। কিন্তু কেহই স্বস্থান হইতে নড়িলেন না। তখন ম্যাজিষ্ট্রেট ও অন্যান্য পুলিশ-কর্ম্মচারী সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট এই সভা বে-আইনী বলিয়া উহা ভাঙিয়া দিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু লাজপৎ রায় বলিলেন, "আমি এই সভা আইন-সঙ্গত বলিয়া মনে করি এবং ইহার সভাপতিরূপে এই সভা ভাঙিয়া দিতে অস্বীকার করিতেছি।" উত্তর শুনিয়া মেজর ফেরার পণ্ডিত রামভূজ দত্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ব্যক্তি কে? লালাজী উত্তর দিলেন, "আমি লাজপৎ রায়।" শুনিয়া মেজর ফেরার বলিলেন, "আমি আপনাকে গ্রেপ্তার করিলাম!"

লালাজী আনন্দের সহিত নিজেকে পুলিশের হস্তে সমর্পণ করিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট তখন মিঃ সনাতনম্ ও ডাঃ গোপীচাঁদকেও গ্রেপ্তার করিলেন।

হাজতে যাইবার সময় মোটর গাড়ীতে উঠিয়া লালাজী তাঁহার সঙ্গীদিগকে বলিলেন, "বিদায়, বন্ধুগণ!" তিনি সভা ভাঙিয়া দিতে বলিলেন এবং সমস্ত বিষয় শান্ত ও অহিংসভাবে গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়া হাজতে চলিয়া গেলেন।

হাজত হইতে লালাজীকে জামিনে খালাস দেওয়ার আদেশ হইল। কিন্তু লালাজী জামিন লইতে অস্বীকার করিয়া হাজতেই রহিয়া গেলেন। সেখান হইতেও তিনি দেশবাসীকে তাঁহার বাণী প্রেরণ করেন। তিনি জানাইলেন যে তাঁহারা যত কঠোরভাবেই উৎপীড়িত হউক না কেন, তাঁহারা যেন ধীর ও অহিংসভাবে শান্তি রক্ষা করিয়া চলেন; কারণ অহিংসাই অসহযোগ আন্দোলনের মূলমন্ত্র।

৭ই ডিসেম্বর বিচারে তাঁহার একবৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইল। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই তাঁহার ভিতর ক্ষয়রোগের লক্ষণ দেখা যাইতেছে বলিয়া ডাক্তারগণ সন্দেহ করিলেন। তখন তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হইল—এই অজুহাতে যে গবর্ণমেণ্ট এতদিনে বুঝিতে পারিয়াছেন, যে-সভায় তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয় তা প্রকাশ্য সাধারণ সভা ছিল না। কিন্তু

এইবারের এই অল্পদিনের কারাবাসেই তাঁহার স্বাস্থ্য চিরতরে ভাঙিয়া পড়িল।

তাঁহার প্রধান রোগ ছিল অনিদ্রা—নানাপ্রকার দুর্ভাবনা, কঠোর মানসিক শ্রম ইহার কারণ। ১৮২৪ সনে তিনি পুনরায় ইংলণ্ডে যান। তখন তিনি প্লুরিসি রোগে আক্রান্ত হন এবং চিকিৎসার্থ কিছু দিন তাঁহাকে সুইট্জারলেণ্ডে থাকিতে হয়। ১৯২৬ সনেও তাঁহাকে চিকিৎসার্থ কিছুদিন ইউরোপে বাস করিতে হয়। ১৯২৭ সনে তিনি পুনরায় ইংলণ্ডে যাত্রা করেন। ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ ডাক্তারগণ তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া ডানদিকের ফুস্ফুসে প্লুরিসির লক্ষণ দেখিতে পান। সেখান হইতে ফ্রান্সে আসিয়া কিছু দিন সমুদ্রতীরে বাস করেন এবং সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

কিন্তু তবু এই ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়াই জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত দেশের জন্য আপ্রাণ পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। এ দেশের যুবকদিগকে রাজনীতি শিক্ষা দিবার জন্য পরলোকগত তিলকের নামে লাহোরে একটি রাজনীতি-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এবং এই উদ্দেশ্যের সহিত সংস্পৃষ্ট রাখিয়া লোকসেবা বা দেশসেবার উদ্দেশ্যে লাহোরে জনসেবক সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। এই সমিতি ও বিদ্যালয়ের জন্য

তিনি তাঁহার নিজের বাড়ী এবং তৎসংলগ্ন সমস্ত ভূমি দান করিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার জীবনের শেষ কাজ, সাইমন কমিশনকে বয়কট করা। আমরা যথাস্থানে দেখিব, এই কাজ করিতে গিয়াই তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের অবসান ঘটিল।

রাজনীতির বিশেষত্ব

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে লাজপৎ রায় যাহা-কিছু করিয়া গিয়াছেন সর্ব্বত্রই তাঁহার চরিত্রের বিশিষ্টতা পরিস্ফুট রহিয়াছে।—তাঁহার বাক্যে ও কাজে সর্ব্বত্রই তাঁহারা চরিত্র-গত একাগ্রতা অকপটতা সাহস এবং অধ্যবসায় অতি উজ্জ্বলরূপে আমরা দেখিতে পাই। তিনি সাধারণ শ্রেণীর নেতা ছিলেন না। নৈরাশ্য তাহার প্রাণে কোন দিন দেখা যায় নাই। ভারতের মুক্তিতে তিনি দৃঢ়-বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু সে বিশ্বাস কল্পনা বা ভাবুকতা-প্রসূত নয়। তিনি ছিলেন প্রকৃত কর্ম্মবীর—তাঁহার কোনো কাজই বাক্য বা বক্তৃতায় পর্য্যবসিত হইত না। তাঁহার রাজনৈতিক জীবনে একমাত্র আদর্শ ছিল, ভারতের স্বরাজ এবং এই স্বরাজলাভের জন্য তিনি নিজে যেমন খাটিয়াছেন, তেমনি তিনি ইচ্ছা করিতেন প্রত্যেক ভারতবাসী বিধিবদ্ধ ভাবে ব্যবসায়ীর ন্যায়

এই কাজে অগ্রসর হয়। এই স্বরাজ বিষয়ে তিনি 'পাঞ্জাবী' পত্রিকায় যাহা বলিয়াছেন তাহা একদিকে যেমন তাঁহার অন্তরের কথা, তেমনি প্রত্যেক ভারতবাসীর তাহা অন্তরের সহিত গ্রহণ করিবারও বিষয়।

তিনি লিখিয়াছেন,—'আমাদের সকল প্রচেষ্টার লক্ষ্য এবং আমাদের সকল আন্দোলনের পুরস্কার দাদাভাই নৌরজি তাঁহার হৃদয়ের আবেগের মুহূর্ত্তে একটি শব্দে প্রকাশ করিয়াছিলেন,—সেই শব্দটি 'স্বরাজ!' এই স্বরাজ-শব্দটি আমাদের রাজনৈতিক সকল আকাঙ্খার সমষ্টি। এখন হইতে 'স্বরাজই' আমাদের যুদ্ধ-গীতি—স্বরাজই আমাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।...কিন্তু কথা হইতেছে, কি করিয়া সেই লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যায়—কি ভাবে তাহা আয়ত্ত করা যায়? অন্তরায় অনেক আছে। কিন্তু আমার মতে সর্ব্বপ্রধান অন্তরায় আমাদের বিশ্বাসহীনতা—এই বিশ্বাসহীনতা আমাদের জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে রহিয়াছে। আর সেই সঙ্গে রহিয়াছে নিজ্জীবভাবে আমাদের অতিরিক্ত ভাবিয়া দেখা—পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করা। অত ভাবিতে গেলে, অত বিচার করিতে গেলে চিন্তা ও কর্ম্মশক্তির পক্ষাঘাত ঘটে।......যদিও আমরা গভীর ধর্ম্মভাবাপন্ন দেশে জন্মিয়াছি, কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্ত্তমানে আমাদের সেই

বিশ্বাস-বল নাই,—যাহা বাধা বিপদকে গ্রাহ্য করে না—সময় অসময়ের লক্ষ্য রাখে না। বিশ্বাসহীন হৃদয়ে আমরা শুধু তন্ন তন্ন করিয়া বিচারই করি এবং হয় তো বা গঠনের চেয়ে ধ্বংশ করিতে বেশি তৎপর। লাভক্ষতির অতি সূক্ষ্ম খতিয়ান করিতে আমরা সক্ষম, কিন্তু বীরের ন্যায় কাজ করিবার উৎসাহ ও সাহস আমাদের নাই। যে-দেশের ইতিহাস সম্মান ও ধর্ম্মের জন্য শত শত নরনারীর সর্ব্বস্ব বলিদানের পুণ্যকাহিনীতে পরিপূর্ণ, দেখিতেছি একশত বৎসরের পশ্চিমের আধিপত্য সেই দেশের নরনারীকে কতকগুলি মাটির পুতুলে পরিণত করিয়া দিয়াছে,—যাহাদের নিজস্ব ইচ্ছাশক্তি বা বিশ্বাস বলিয়া কোনো জিনিষ নাই। ভগবানকে ধন্যবাদ, দেশ হইতে ধর্ম্মভাব সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয় নাই। সোণা রহিয়াছে—তাহাতে দেশবাসীর জন্মস্বত্বও আছে,—চাই শুধু সেই ঐন্দ্রজালিকের স্পর্শ, যে উহা আবিষ্কার করিয়া দেশবাসীকে পুনরায় ফিরাইয়া দিবে।...
ভারতবাসীকে এই কথা উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে বাস্তব পথে অগ্রসর হইয়া লক্ষ্য আয়ত্ব করিতে হইলে ত্যাগের ভিতর দিয়া যাইতে হইবে—একবার নয়, দুইবার নয়, —আজীবন শুধুই আত্মত্যাগ। আমাদের সম্মুখে কাজ শুধু ভারতবাসীকে এক সম্মিলিত জাতি বা নেশনে পরিণত করা

নয়, তাহাকে এমন মহৎ ও শক্তিশালী করিয়া তুলিতে হইবে যেন সে আমাদের প্রাচীন গৌরবের উপযুক্ত হয়, আর যেন তার ভবিষ্যৎ আদর্শের প্রতি সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকে।"

তিনি বিশ্বাস করিতেন না যে, সরকারের নিকট হইতে একটু একটু করিয়া দানলাভ করিয়া ভারতবাসী 'নেশনে' বা এক রাজনৈতিক জাতিতে পরিণত হইবে, অপরপক্ষে তিনি ইহাও মনে করিতেন না যে, সরকারের নিষ্পেষণ দেশের লোকের আকাঙ্ক্ষা ও উৎসাহকে দমন করিতে পারিবে। তিনি বলিতেন, আমাদের লক্ষ্যআয়ত্বের একমাত্র পথ দেশপ্রীতিকে ধর্ম্মের সমকক্ষ করিয়া তোলা—ইহারই জন্য বাঁচিয়া থাকা, অথবা ইহারই জন্য মৃত্যুকে বরণ করা।

রাজনীতি বা সামাজিক ব্যাপারে তিনি কোনোরূপ হঠাৎ-পরিবর্ত্তনের পক্ষপাতী ছিলেন না; কিন্তু তাই বলিয়া তিনি রক্ষণশীলও ছিলেন না। তিনি চাহিতেন সুনির্দ্দিষ্ট পথে দৃঢ়পদক্ষেপে অগ্রসর হওয়া। সর্ব্বদা তিনি মিলনের পক্ষপাতী ছিলেন। ১৯০৬ সালে কংগ্রেসে নরম ও উগ্রন্থীদের ভিতর যে বিরোধ ঘটে তাহা মিটাইবার জন্য তিনি প্রভূত চেষ্টা করিয়াছিলেন। উগ্রপন্থীরা তাঁহাকেই কংগ্রেসের সভাপতি করিবার জন্য ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু দুই দলের বিরোধের ভিতর দিয়া তিনি সেই কংগ্রেসের সভাপতির

আসন গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন। এই কাজে তাঁহার পরম শত্রু ভারতীয় ইংরেজেরাও তাঁহার প্রশংসা না করিয়া পারে নাই।

তারপরে ১৯০৭ সনের সুরাট কংগ্রেসে যখন দুই দল দারুণ উত্তেজনার সহিত হাতাহাতি মারামারি জুতা-ছোড়া প্রভৃতি দ্বারা দক্ষযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিল তখনো তিনি মিলনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। এইরূপ উত্তেজনাপূর্ণ ব্যবহার সম্বন্ধে একবার তিনি বলিয়াছিলেন,—"রাজনৈতিক আন্দোলনে পাশ্চাত্য রীতিসমূহের সঠিক অনুকরণ করা আমাদের অবস্থায় সম্ভব নয়, কিন্তু সেই মনোভাব হৃদয়ঙ্গম করা ও গ্রহণ করার অধিকার আমাদের নিশ্চয়ই আছে।"

তিনি কঠোর কর্ম্মশক্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন। মানবীয় সহৃদয়তা তাঁহার ভিতর অত্যন্ত প্রবল ছিল এবং উহাই তাঁহার জীবনে সফলতার কারণ। কিন্তু প্রয়োজন হইলে তিনি সুতীব্র আঘাত করিতেও জানিতেন এবং সেই জন্যই সরকারী আমলাবর্গের ভিতর তাঁহার এত শত্রু ছিল। কোনোরূপ মিথ্যা ভড়ং বা অসরলতা তিনি হৃদয়ের সহিত ঘৃণা করিতেন। তিনি নিরাশাবাদী ছিলেন না, দেশের সৌভাগ্য সম্বন্ধে তাঁহার অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। তাই তিনি

দেশের সর্ব্বপ্রধান জটিল প্রশ্ন সম্বন্ধে বলিতেন,—

"আমি বিশ্বাস করি না যে হিন্দুমুসলমানের মিলন মরীচিকা মাত্র,—আর যদিবা তাই হয়, তবু আমরা এই বিশ কোটি হিন্দু আছি কিসের জন্য ? দেশের বর্ত্তমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা বৈরাগ্যের সহিত মানিয়া লইয়া আমরা কি দেশকে আরো দুঃখপঙ্কে নিমগ্ন করিব, না, তার জাতীয় মৃত্যুর কারণ হইব ? আমি অন্ততঃ এইরূপ নৈরাশ্যের হাতে নিজকে ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত নই। আমার ধর্ম্ম—আশা ও বিশ্বাসের। আমি সংগ্রামে বিশ্বাসী—সৎপথে কঠোর অনম্র সংগ্রাম। বস্তুতঃ, আমাদের হতাশ হইবার কারণ-গুলিকে আমি আমাদের আরো দৃঢ়ভাবে সংগ্রাম করিবার কারণ বলিয়াই মনে করি,—ইহাই আমার রাজনীতির ধর্ম্ম। আমার রাজনৈতিক নীতি অনুসারে আমি বিশ্বাস করি যে, কোনো জাতি একমাত্র তার নিজের চেষ্টাতেই উত্থিত হয় এবং সততাই তাকে মহিমান্বিত করে।"…

লাজপৎ রায় হিন্দু মহাসভার একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং এই হিন্দু মহাসভার ভবিষ্যৎসম্বন্ধে তাঁহার পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি ভারতের জন্য হিন্দু-রাজ চাহিতেন না, চাহিতেন তিনি হিন্দু-মুসলমানের

ভেদাভেদহীন স্বরাজ। ১৯২৫ সনে কলিকাতায় হিন্দু মহাসভার এক অধিবেশন হয়। উহার সভাপতিরূপে তিনি বলিয়াছিলেন,—

"আমাদের দেশের কোনো কোনো মুসলমানের মনে এইরূপ এক ভীতি জাগিয়াছে যে, হিন্দুগণ হিন্দুরাজ প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করিতেছে। ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে মুসলমানদের কণ্ঠে মুস্লিমরাজের ধ্বনি শুনিয়া উহার প্রতিশোধরূপে কোনো কোনো হিন্দুও হিন্দুরাজের পক্ষে যুক্তি প্রয়োগ করিতেছেন। আমরা জানি যে সকল মুসলমানই মুস্লিমরাজ চান না, তেমনি ইহাও আমরা জানি যে বেশির ভাগ হিন্দুই হিন্দু-রাজের জন্য আকাঙ্খিত নন। এই শেষোক্ত দল সকল জাতি ও সকল শ্রেণীর সর্ব্বপ্রকারের সুখ-সুবিধার সম্বন্ধে ন্যায়পরায়ণ দৃষ্টি রাখিয়াই জাতীয় শাসন-কর্ত্তৃত্বলাভের জন্য চেষ্টা করিতেছেন। আমার বিবেচনায় হিন্দুরাজ বা মুস্‌লিম-রাজ বলিয়া এই যে চীৎকার, ইহা সর্ব্বতোভাবে অনিষ্টকর এবং ইহাকে দমন করা উচিত। এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্রও দ্বিধা নাই যে, হিন্দুরাজ বা মুস্‌লিম-রাজ এই দুইটিই সম্পূর্ণ অসম্ভব। আমাদের ঠিক যে জন্য চেষ্টিত হওয়া উচিত তাহা গণতন্ত্র-রাজ,—যাহাতে হিন্দু, মুসলমান ও অন্যান্য সকল জাতি যোগ দিবে শুধুই

ভারতবাসী-রূপে—কেনো বিশেষ ধর্ম্মাবলম্বীরূপে নয়।”

রাজনীতিক্ষেত্রে আমাদের দেশে নেতার অভাব নাই,—হয়তো বর্ত্তমান যুগে আমরা অতিরিক্ত রাজনীতির চর্চ্চা করিতেছি। দুই শ্রেণীর নেতা আমরা দেখিতে পাই। উভয় শ্রেণীই বক্তৃতা লেখা বা অন্যান্য নানারকমের কাজে ব্যাপৃত। কিন্তু এক শ্রেণী আদর্শবাদী—খুব উচ্চ আদর্শ লইয়া স্বপ্ন দেখেন, বাস্তবক্ষেত্রের অবস্থা বিবেচনা করিয়া দেখেন না। অপর শ্রেণী উচ্চ আদর্শের ধার ধারেন না—সহজে স্বল্প চেষ্টায় যতটুকু সুবিধা ও অধিকার পাওয়া যাইতে পারে তাহারই সন্ধানে ফিরেন।

কিন্তু লাজপৎ রায় সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁহার আদর্শ ছিল উচ্চ, আশা ছিল অসীম এবং সে সম্বন্ধে মহৎ স্বপ্নও তিনি দেখিতেন। কিন্তু তাঁহার স্বপ্ন-দেখায় বিশেষত্ব ছিল,—তিনি স্বপ্ন-বিলাসী ছিলেন না—স্বপ্ন তাঁহাকে পঙ্গু বা অবাস্তব করিয়া তোলে নাই।

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লাজপৎ রায়ের রাজনৈতিক মনস্তত্ত্বের যে বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহা প্রণিধান-যোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন,—‘স্বপ্ন ত্যাগ না করিয়া, আদর্শ ছাড়িয়া না দিয়া, আপাততঃ যাহাতে সিদ্ধিলাভ

অপেক্ষাকৃত সম্ভবপর, সেইরূপ চেষ্টায় তিনি আপত্তি করিতেন না। এই কারণে, যদিও তিনি লিখিয়া গিয়াছেন, "এমন হীন কে আছে যে স্বদেশের জন্য পূর্ণ স্বাধীনতা চায় না ?" বলিয়া গিয়াছেন, পূর্ণ স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা আমার মনের মধ্যে আছে" ; তথাপি তিনি ডোমিনিয়ন অবস্থা লাভের চেষ্টায় সম্মতি দিয়াছিলেন। তিনি যে ভয়ে ডোমিনয়ন-অবস্থার পক্ষে মত দেন নাই, তাঁহার সমস্ত জীবন ও তাঁহার মৃত্যু তাহার সাক্ষ্য দিতেছে,—সাক্ষ্য দিতেছে তাঁহার মৃত্যুর কয়েক দিন আগেকার এই উক্তি—"আবশ্যক ও সাধ্যায়াত্ব হইলে দেশকে দাসত্ব-শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবার নিমিত্ত আমি বল-প্রয়োগেও পশ্চাৎপদ হইব না।"

'বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে রাজনীতিক্ষেত্রে যত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি আছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহই লালাজীর স্থলাভিষিক্ত হইতে পারেন না। তাঁহাদের কাহারও হিতৈষণা তাঁহার হিতৈষণার মত বহুমুখী ও ফলবতী নহে। বিশ্বাসে, জ্ঞানে, বাগ্মিতায়, আদর্শানুরাগে, কর্ম্মিষ্ঠতায়, আত্মোৎসর্গে, সাহসে, দেশের উন্নতির আদর্শের ব্যাপকতা ও গভীরতায় একাধারে তাঁহার মত কেহই নহেন। তাঁহার আসন আপাততঃ শূন্য থাকিবে।'

লাজপৎ রায়ের বিশেষত্ব

লাজপৎ রায় অদ্ভুত প্রতিভাবান দেশভক্ত মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁহার প্রতিভার ও দেশপ্রীতির বিশেষত্ব এই যে, উহা স্বল্পপরিসর বা সীমাবদ্ধ ছিল না—দেশের বহুক্ষেত্রে তাঁহার মঙ্গল-হস্ত প্রসারিত হইয়াছিল এবং সর্ব্বত্র তাহা সফলতায় মণ্ডিত।—সমগ্র দেশকে তিনি আপন অন্তরের ভিতর গ্রহণ করিয়াছিলেন। দেশের যে-ক্ষেত্রেই সংস্কার বা উন্নতির প্রয়োজন, সেখানেই তিনি বীরের ন্যায় অক্লান্তভাবে নিজেকে নিয়োগ করিয়া গিয়াছেন।

আর্য্যসমাজের দীক্ষা লইয়া তিনি উন্নত সংস্কারমুক্ত ধর্ম্মজীবন লাভ করিয়াছিলেন। ইহা তাঁহাকে পবিত্র করিয়াছিল—সুদৃঢ় আধ্যাত্মিক ভাব দ্বারা অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। তাঁহার এই সত্যিকার আধ্যাত্মিক ভাবই তাঁহাকে সেই শক্তি দিয়াছিল, যাহা শত দুঃখ বিপদ ও পরাজয়ের মধ্যেও কোনো দিন এতটুকু ম্লান হয় নাই। লাজপৎ রায় এই ধর্ম্মের লৌহ-বর্ম্মে আবৃত থাকিয়া

যে-অক্ষয়-কবচের অধিকারী ছিলেন, তাহা মহাত্মা গান্ধী ছাড়া স্বদেশের বা বিদেশের খুব কম নেতারই আছে। এইরূপ নেতা দুর্ল্লভ এবং দেশের পরম সম্পদ।

প্রথম জীবনে তিনি ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কারকরূপে কার্য্যে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ইহাই স্বাভাবিক হইয়াছিল। এই কাজের ভিতর দিয়াই তাঁহার চরিত্র এমন মহৎভাবে গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায়, যেখানে রাজশক্তি পরহস্তগত বলিয়া উহা দ্বারা কোনোরূপ সংস্কার সম্ভব নয়, অথচ ধর্ম্ম ও সমাজ আবর্জ্জনায় ভরিয়া রহিয়াছে, সেখানে দেশসেবকের প্রথম কাজ এই স্থানে। এই কাজে তিনি কতখানি সফলতা লাভ করিয়াছিলেন, উত্তর-ভারতের প্রত্যেক নরনারী তাহার সাক্ষ্য দিতে সক্ষম।

তারপর তাঁহার লোকসেবা,—সংস্কারের জন্য নয়, শুধুই পরের দুঃখ দূর করিবার জন্য এবং স্বদেশের মঙ্গলের জন্য। তাঁহার অনাথ-সহায়ক আন্দোলনের বিবরণ ইতিপূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। কাঙ্গরার দুঃস্থ লোকদিগকে কি ভাবে তিনি সাহায্য করিয়াছিলেন তাহাও আমরা দেখিয়াছি। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত অনাথ-আশ্রমগুলি তাঁর কর্ম্ম-রাজ্যের উজ্জ্বল নক্ষত্র। অনুন্নত জাতির উন্নতি-বিধান আজকাল অনেক নেতার নিকট একটা 'ফ্যাশনের' বিষয়, কিন্তু বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই তিনি

উহা জীবনের একটি প্রধান কাজরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

অর্থ-উপার্জ্জন ও অর্থ-সঞ্চয় জীবনের প্রধান কাজ বলিয়া তিনি গ্রহণ করিতে পারেন নাই। সারাজীবন তিনি দানে মুক্তহস্ত ছিলেন। মৃত্যুর কয়দিন পূর্ব্বেও তিনি ও তাঁহার স্ত্রী ক্ষয়রোগীর চিকিৎসার্থে একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার জন্য একলক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন, এবং আরো প্রায় এক লক্ষ টাকা এই উদ্দেশ্যে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। লাহোরে প্রথম ওকালতি আরম্ভ করিবার সময় হইতেই তিনি যেমন উপার্জ্জন করিয়াছেন, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে তাহা দানও করিয়া গিয়াছেন। নিজে তিনি চিরকাল অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কয়েকটি দানের কথা এখানে উল্লেখ করা হইল।

তিলক রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়ের জন্য ৩০,০০০৲ টাকা, বর্দ্ধমান বিভাগের বন্যাপীড়িতদের সাহায্যার্থ ১,০০০৲ টাকা, আর্য্য-সমাজের কলেজ বিভাগের উন্নতির জন্য ৫০,০০০৲ টাকা, ভারতের উপেক্ষিত সম্প্রদায়সমূহের উন্নতির জন্য ৩০,০০০৲ টাকা এবং স্বীয় জন্মভূমিতে স্বর্গীয় পিতার নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্যে ১০,০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। এ ছাড়া তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডারে তিনি বহু অর্থ দান করিয়াছেন। জীবনে যাহা কিছু সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহার

অধিকাংশই দয়ানন্দ কলেজে দান করিয়াছেন। তাঁহার বিশাল গ্রন্থাগারটিও তিনি এই কলেজে দান করিয়াছেন।

তিনি লাহোরে জন-সেবক সমিতি নামে যে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছেন তাহার জন্য তাঁহার লাহোরের নিজের বাড়ী ও তৎসংলগ্ন বিস্তৃত ভূমি দান করিয়া গিয়াছেন।

নিজে দরিদ্রের সন্তান ছিলেন কিন্তু তবু নিজের সুখ-সুবিধার জন্য কিছুই তিনি রাখিতেন না। পোষাকে বা চলাফেরায় তিনি যে সন্ন্যাসী ছিলেন তাহা নয়, সাধারণ গৃহস্থের ন্যায়ই তিনি স্ত্রী-পুত্র লইয়া জীবন যাপন করিতেন ও অর্থ উপার্জ্জন করিতেন। কিন্তু যাহা উপার্জ্জন করিতেন তাহার প্রতি তাঁহার কোনোরূপ আকর্ষণ ছিল না। তিনি উপার্জ্জন করিয়াছেন যথেষ্ট কিন্তু তাহা প্রধানতঃ দেশের সেবার জন্য,—নিজের জন্য কিছুই রাখিতেন না। নিজে সম্পূর্ণ অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিতেন। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি অর্থকে তুচ্ছ মনে করিতেন না। অর্থের ক্ষমতা তিনি জানিতেন। তাই তাঁহার কর্ম্মজীবনের এক দিক ছিল দেশকে সমৃদ্ধ-করা ও সমৃদ্ধ রাখা। তিনি দেখিলেন, বিদেশীয় ব্যাঙ্ক ও জীবনবীমা কোম্পানীর দ্বারা বহু টাকা বিদেশে চলিয়া যায়। ইহা যতদূর সম্ভব নিবারণ করিবার

জন্য তিনি অপরের সহিত মিলিত হইয়া দেশী ব্যাঙ্ক ও জীবনবীমা কোম্পানী প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন। দেশের ধন-বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কতকগুলি কাপড়ের কলেরও তিনি অন্যতম পরিচালক ছিলেন।

সংস্কার-কার্য্য ও রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতার বক্তৃতা-শক্তি থাকা প্রয়োজন। লাজপৎ রায়ের তাহা প্রচুর পরিমাণে ছিল। হিন্দুস্থানী ও ইংরেজী এই উভয় ভাষায় তিনি অতি সারবান ও উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতা করিতে পারিতেন। এদেশে ও বিদেশে সকলেই তাঁহার বাগ্মিতায় মোহিত হইয়াছে। উর্দ্দু বক্তৃতায় তাঁহার সমকক্ষ কেহ ছিল না। বক্তৃতাকালে তাঁহার অন্তরের কথা যেন আগ্নেয়গিরির জ্বলন্ত অঙ্গারের ন্যায় তাঁহার মুখ দিয়া নিঃসৃত হইত। অনাবিল একাগ্রতা ও অকপটতার জন্য তাঁহার প্রত্যেক বাক্য শ্রোতার অন্তরে গিয়া স্পর্শ করিত। এই অসাধারণ বক্তৃতা-শক্তি তাঁহার নেতার কাজে কম সহায় ছিল না।

তাঁহার এই বক্তৃতা-শক্তি যেমন প্রচুর ছিল, তেমনি প্রচুর ছিল তাঁহার লিখিবার শক্তি। তিনি একজন উচ্চাঙ্গের লেখক ও জারণেলিস্ট্ বা সাংবাদিক ছিলেন। "বন্দেমাতরম্" নামক উর্দ্দু এবং "পীপল্" নামক ইংরেজি কাগজ তিনি স্থাপন করেন। দিল্লীর "হিন্দুস্থান টাইম্‌সেরও" তিনি একজন

অধ্যক্ষ ছিলেন। এদেশের এবং আমিরেকা ও ইংলেণ্ডের বহু সাময়িক পত্রিকায় তিনি শত শত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। মডার্ণ-রিভিউতে তিনি কখনও নিজের নামে, কখনো বা "ইজ্জৎ" এই ছদ্মনামে বহু প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন। উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ-লেখকরূপে তিনি শুধু এদেশে নয়, বিদেশেও যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। এই সকল প্রবন্ধ লাজপৎ রায়ের প্রভূত চিন্তা-শক্তি ও তীক্ষ্ণ বিচার বুদ্ধির পরিচয় দেয়।

প্রবন্ধ ছাড়া তিনি অনেকগুলি পুস্তকও রচনা করিয়াছিলেন। এই পুস্তকগুলিই তাঁহার অর্থার্জ্জনের প্রধান উপায় ছিল। তাঁহার রচিত দেশের ও বিদেশের শক্তিমান পুরুষদিগের জীবনী সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। তাহা ছাড়া লাজপৎ রায়ের আরো অনেকগুলি ইংরেজি পুস্তক আছে। তাঁহার রচিত "আর্য্য-সমাজ" একটি প্রসিদ্ধ পুস্তক। ইংলেণ্ডে এই পুস্তকের যথেষ্ট আদর হইয়াছে। এই পুস্তকে তিনি আর্য্যসমাজের উৎপত্তি, ইহার ইতিহাস, ক্রমোন্নতি, ইহার সংস্কার ও লোকহিতকর কাজ এবং ইহার শিক্ষা ও ধর্ম্মমত প্রভৃতি বিষয় অতি প্রাঞ্জলভাবে সুন্দর ভাষায় বিবৃত করিয়া গিয়াছেন। আর্য্যসমাজের ইতিহাস ও ধর্ম্মমত সম্বন্ধে ইহার চেয়ে উৎকৃষ্টতর আর কোনো পুস্তক নাই।

"আর্য্যসমাজের" মতই বা ততোধিক প্রসিদ্ধ পুস্তক তাঁহার রচিত যুক্ত-রাজ্য বা "ইউনাইটেড্ স্টেট্স্ অফ্ এমেরিকা।" আমরা দেখিয়াছি তিনি স্বেচ্ছায় ও অনিচ্ছায় বহু বৎসর আমেরিকায় কাটাইয়াছিলেন। তিনি সেই দেশের সমাজ, শিক্ষা ও রাজনীতি সম্বন্ধে গভীর পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন। তাহারই ফল লাজপৎ রায়ের এই প্রসিদ্ধ পুস্তক। কি উদ্দেশ্যে তিনি এই পুস্তক লিখিয়াছিলেন তাহা তাঁহার নিজের ভাষায়ই স্পষ্ট বুঝা যাইবে। তিনি লিখিয়াছেন,—

"আমাদের নিজেদের উন্নতির জন্য যাহা যাহা প্রয়োজন, প্রধানতঃ সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই আমি আমেরিকার সেই-সব বিষয়ের পর্য্যালোচনা করিয়াছি। আমাদের দেশে যে-সমস্ত সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে, যুক্তরাজ্যেও সেইরূপ বহু সমস্যা আছে এবং আমি বিবেচনা করি যে, যুক্তরাজ্যের এইসব সমস্যা ও কিভাবে এইসব সমস্যার প্রতিবিধান হইয়াছে, সে-সম্বন্ধে আলোচনা করিলে উহা হইতে আমাদের দেশের লোকেরা অনেক শিক্ষা ও সাহায্য পাইতে পারে।"

তিনি যখন আমেরিকায় ছিলেন তখন ইয়ং ইণ্ডিয়া নামক একটি পুস্তকে আধুনিক ভারতবর্ষের রাজনৈতিক প্রচেষ্টার একটি বৃত্তান্ত লেখেন। এই পুস্তক ভারতবর্ষে আনয়ন করা

গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হইয়া গেল। কয়েক বৎসর পরে গবর্ণমেণ্টের মর্জ্জি অনুসারে সেই নিষেধ-আজ্ঞা রহিত হইলে ভারতবর্ষে সেই পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল।

তাঁহার শেষ পুস্তক "আনহ্যাপি ইণ্ডিয়া।" মিস্ মেয়োর মাদার ইণ্ডিয়ার পরিচয় কাহাকেও দিবার প্রয়োজন নাই। ভারতের নিন্দাপূর্ণ এই পুস্তকের তীব্র সমালোচনা অনেকেই করিয়াছেন এবং এই পুস্তকের উত্তর-স্বরূপ ভারতের পক্ষ হইতে কয়েকটি পুস্তকও প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু লাজপৎ রায়ের আনহ্যাপি ইণ্ডিয়া এই সব পুস্তকের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও বৃহত্তম।

লাজপৎ রায়ের হৃদয়ের সম্পদের কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। তাঁহার হৃদয়ের অকপটতা, তাঁর বিশ্বাস, জ্ঞান, দয়া, আদর্শানুরাগ, সাহস, ও সম্পূর্ণভাবে আত্মোৎসর্গ,—একাধারে এই সব গুণ সুদুর্লভ। তাঁহার বাগ্মিতা ও কর্ম্মিষ্ঠতা, আদর্শের ব্যাপকতা ও গভীরতা অনন্যসাধারণ। দেশ-দেহের প্রত্যেক অঙ্গ তিনি সুস্থ সবল করিয়া তুলিয়া উহাকে মহাশক্তি প্রদান করিবার জন্য নিজেকে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এদেশে তাঁহার সমকক্ষ নেতা নাই,—যেকোনো দেশে এইরূপ নেতা দুর্লভ ও দেশের পরম সম্পদ।

মৃত্যু

"পঞ্চ-নদীর তীরে
ভক্ত বীরের রক্ত-লহরী
মুক্ত হইল কি রে ?"

কবির এই প্রশ্ন আজ সমগ্র ভারতের প্রত্যেক নরনারীর হৃদয়ে উত্থিত হইয়া বেদনা ও বিক্ষোভের সৃষ্টি করিয়াছে। মনে পড়িতেছে সেই ভক্তবীরের কথা, যে অত্যাচারী ক্ষুদ্রদৃষ্টি শাসকের নিকট ধর্ম্ম ও সম্মান রক্ষার জন্য অম্লান-চিত্তে নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছিল। লাজপৎ রায়ও কি জাতির সম্মান ও নিজের রাজনৈতিক ধর্ম্ম রক্ষা করিতে গিয়া প্রাণদান করিলেন ?...সেই পঞ্চ-নদীর তীরে তেমনি ভক্ত বীরের এই মৃত্যু,—তবে, এ মৃত্যু, কি আত্মাহুতি, না হত্যা, সে-প্রশ্নের মীমাংসা ভগবান ছাড়া কাহারো করিবার অধিকার নাই—মানুষ শুধু অনুমান করিতে পারে।

লাজপৎ রায়ের শিক্ষা ও আদর্শ যেমন ভারতবাসীর ভুলিলে চলিবে না, তেমনি যে-ভাবে তাঁহার মৃত্যু ঘটিল তাহাও তাঁহার হৃদয়পটে অক্ষয়ভাবে মুদ্রিত করিয়া রাখিতে



লালা লাজপৎ রায়

বুকে পুলিশের লাঠির আঘাতের জখম তীর-চিহ্ন দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। এই ফটো আঘাতের ২৯ ঘণ্টা পরে গৃহীত।

হইবে। বাঁচিয়া থাকিতে তিনি যেমন দেশের সম্পদ ছিলেন, তাঁহার এই মৃত্যুও দেশের পক্ষে কম সম্পদ নয়। স্বাধীনতা-সংগ্রামে যাঁরা জীবন দান করেন, তাঁদেরই রক্তে স্বাধীনতা-বৃক্ষ পরিপুষ্ট হয়,—অপর যোদ্ধারা সেই রক্ত নিজেদের ধমনীতে গ্রহণ করিয়া শক্তিশালী হইয়া উঠেন।

বলা হইয়াছে, লাজপৎ রায়ের মৃত্যু দেশের সম্পদ। তাই তাঁহার মৃত্যুর ইতিহাস আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করি।

ভারতবর্ষের কোনো সভ্য গ্রহণ না করিয়া তাঁহাদের দাবী অগ্রাহ্য ও সম্পূর্ণ অবহেলা করিয়া সাইমন কমিশন গঠিত হইল। ভারতবাসী এই অপমানকর কমিশন চায় নাই; তাই এই কমিশন যেখানেই গিয়াছেন, সেখানেই ভারতবাসীরা যে উহা চায় না, সে-কথা নিরুপদ্রব শোভাযাত্রা প্রভৃতি দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু আত্মাভিমানী অতি-ব্যগ্র পুলিশ-কর্ম্মচারীরা জনতার উপর লাঠি চালাইয়াছে। কমিশনের বোম্বাইয়ে অবতরণ হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত দেশের কতস্থানে যে এই সম্পর্কে পুলিশের লাঠি চলিয়াছে তাহার ইয়ত্বা নাই। তাই শ্রদ্ধেয় রামানন্দবাবু ইহাকে বিদ্রূপ করিয়া লাঠি-কমিশন এই নাম দিয়াছেন। এই লাঠি-চালনা কমিশনের অনুমোদিত কিনা, জানা যায় নাই—অননুমোদিত

কিনা তাহারও কোনো প্রমাণ নাই।

যাহাহউক, ১৯২৮ সনের গত ৩০শে অক্টোবর এই কমিশন লাহোরে অবতীর্ণ হইলেন। লাহোরের নেতারা বহু লোক লইয়া একটি শোভাযাত্রা গঠন করিয়া রেলওয়ে ষ্টেশনের দিকে রওনা হইলেন,—বলাবাহুল্য, কমিশনকে বিদায়-সম্ভাষণ জানাইবার জন্য—অভ্যর্থনার জন্য নয়। এই শোভাযাত্রার অগ্রভাগে ছিলেন লালা লাজপৎ রায়, পণ্ডিত মালব্য প্রভৃতি জন-নায়কগণ। বৃদ্ধ জরাজীর্ণ লাজপৎ রায় তখন অসুস্থ। কিন্তু তিনি বুঝিলেন, দেশের মনোভাব সাইমন কমিশনকে জানানো ও ঘোষণা করা প্রয়োজন। কিন্তু যে-কাজ তিনি করিতে যাইবেন তাহাতে পশ্চাৎভাগে থাকা তাঁহার স্বভাব নয়, তিনি স্থান নিলেন শোভাযাত্রার প্রথম সারিতে।

শোভাযাত্রা কিন্তু রেলওয়ে ষ্টেশন পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারিল না, কারণ ষ্টেশনের সামনের পথ পুলিশ কাঁটা তার দিয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। সেই বেড়ার কাছে আসিয়া জনতা দাঁড়াইল। তাঁহারা সম্পূর্ণভাবে নিরুপদ্রব ছিলেন; শুধু মাঝে মাঝে 'সাইমন ফিরিয়া যাও'—এই চীৎকার করিতেছিলেন। ইহাতেই পুলিশের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল; তাহারা জনতার উপর লাঠি চালাইতে লাগিল।

একজন ইংরেজ পুলিশ-কর্ম্মচারী লালাজীর কোটের কলার বাম হাতে ধরিয়া তাঁহার বুকে সজোরে লাঠির আঘাত করিতে লাগিল। তাহার দেখাদেখি কয়েকটা দেশী পুলিশও তাঁহার উপর লাঠি চালাইল।

তেত্রিশ কোটি ভারতবাসীর মুকুটহীন নরপতি নীরবে এই আঘাত ও লাঞ্ছনা সহ্য করিলেন।

আঘাতের পর লালাজী বারবার সেই ইংরেজ পুলিশ-কর্ম্মচারীর নাম জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, কিন্তু সেই বীরপুরুষ সাহস করিয়া নিজের নাম বলিল না। রায়জাদা হংসরাজ, ডাঃ গোপীচাঁদ এম্, এল্ সি, ডাঃ সত্যপাল এবং অন্যান্য নেতা ও সেবকগণও আঘাত পাইয়াছিলেন। অনেকেই সেই ইংরেজ পুলিশ-কর্ম্মচারীর নাম জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন কিন্তু উপদ্রবহীন অসহায় নিরস্ত্র বৃদ্ধ দেশনেতার উপর বিনাকারণে আঘাতকারী বীর সেই প্রশ্নের উত্তর না দিয়া সরিয়া পড়িল।

লালাজীর আঘাত অতি গুরুতর হইয়াছিল। তাঁহার হৃৎপিণ্ডের উপর অতি প্রচণ্ড আঘাত পড়িয়াছিল, তাহা ছাড়া স্কন্ধ ও অন্যান্য স্থানেও বহু আঘাত পাইয়াছিলেন। পাঠক তাঁহার বুকের ও কাঁধের নীচের আঘাতের স্ফীতি ও ক্ষতচিহ্ন ছবিতে দেখিতে পাইবেন।

কে এমন ভারতবাসী আছে যে শুষ্ক চোখে এই ক্ষতচিহ্ন দুটির দিকে তাকাইতে পারে? প্রত্যেক ভারতবাসীর বক্ষেও কি এই ক্ষতচিহ্ন তার প্রতিরূপ রাখিয়া যায় নাই? এই ক্ষতচিহ্ন একমাত্র সেই দিনই মুছিয়া যাইতে পারে যে-দিন ভারতবর্ষ তার স্বাধীনতা অর্জ্জন করিবে।

আঘাতের পর হইতেই তাঁহার শরীর ভাঙিয়া পড়িল। তাঁহার জ্বর হইতে লাগিল এবং হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা উপস্থিত হইল। তাঁহার আঘাতের ঘটনা সম্বন্ধে ডাঃ গোপীচাঁদ লিখিয়াছেন,—"গত ৩০শে অক্টোবর লালাজীকে যখন আহত করা হয় তখন আমি তাঁর সঙ্গে ছিলাম। আমার নিজের মস্তকের আঘাত এরূপ সাংঘাতিক হইয়াছিল যে কিছুক্ষণের জন্য আমি যেন মূর্চ্ছাহত হইয়াছিলাম—কোথায় আমার আঘাত লাগিয়াছিল তাহাও বুঝিতে পারি নাই। লালাজী যে তখনই মারা যান নাই, ইহা এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। তাঁহার জরাজীর্ণ দেহের উপর অতি সাংঘাতিক আঘাত পড়িয়াছিল। জনতাকে চলিয়া যাইতে বলিয়া দিয়া তিনি বাড়ী চলিয়া গেলেন। বাড়ী যাইয়াই তাঁহার জ্বর হইল।... আমি তাঁহাকে সর্ব্বদা দেখিতে যাইতাম। ক্রমশই তাঁহার শরীর খারাপ হইয়া পড়িল এবং যত দিন যাইতে লাগিল ততই তিনি নিজ্জীব ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিলেন।...

লক্ষ্মী বীমা কোম্পানীর সভার দিন সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিবার সময় ও নামিবার সময় দুই বার তাঁহার শ্বাসরোধ হইয়া গিয়াছিল।……এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই যে, এই আঘাত না পাইলে তিনি আরো বহু বৎসর বাঁচিয়া থাকিতেন,—এই আঘাতই তাঁহার হৃৎপিণ্ডের কার্য্য বন্ধ হইবার প্রধান কারণ।”

এ যাবৎ লালাজী কোনো অসুখেই ভাঙিয়া পড়েন নাই, কিন্তু এই ৩০শে অক্টোবরের গুণ্ডা-পুলিশের আঘাত উৎরাইয়া ওঠা আর তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইল না। গত ১৭ই নভেম্বর হৃৎপিণ্ডের কার্য্য বন্ধ হইয়া তাঁহার মৃত্যু ঘটিল। পাঞ্জাব-কেশরীর অমর আত্মা জঘণ্য কলুষহস্তে প্রহৃত দেহ ত্যাগ করিয়া অমরলোকে চলিয়া গেল।…কিন্তু তাঁহার অমর-লোক কোথায়? স্বদেশ ছাড়া শ্রেষ্ঠতর স্থানের কল্পনা তাঁহার হৃদয়ে ছিল না,—তাই মনে হয় স্বদেশের সহস্র সহস্র লালাজীর প্রাণে অনুপ্রবিষ্ট হইবেন বলিয়াই তাঁহার আত্মা নিজের এক দেহ ত্যাগ করিলেন।…

রেলওয়ে ষ্টেশনে পুলিশের অত্যাচারের পর লাহোরে এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়। লালাজী আহত শরীর নিয়াই সেই সভায় উপস্থিত হন। সেখানে তিনি যে উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতা দেন তাহা এক দিকে ভারতবাসীদের

এবং অপর দিকে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিশেষরূপে ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। আমরা নিম্নে তাহার তাৎপর্য্য দিলাম।

ঘটনার বিবরণ দিয়া তিনি বলিয়াছিলেন,—"রায়জাদা হংসরাজের উপর আঘাত পড়িতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হাত হইতে প্রচুর রক্তপাত হইতে লাগিল। ডাঃ গোপীচাঁদ, ডাঃ সত্যপাল, ডাঃ আলম ও আরো অনেকে নানা ভাবের সাংঘাতিক আঘাত পাইলেন। আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি যে এই সব ভদ্রলোকেরা এমন কিছুই করেন নাই যাহাতে পুলিশের নিকট হইতে এইরূপ জঘণ্য ব্যবহার পাইতে পারেন।

শোভাযাত্রা বাহির করিবার আগে আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিয়াছিলাম যেন কাহারো হাতে লাঠি না থাকে। এই সহস্র সহস্র লোকের ভিতর আমি মাত্র দুই তিন জন লোকের হাতে বেড়াইবার ছড়ি দেখিয়াছি। আমার হাতেও সেইরূপ একটি ছড়ি ছিল। ভগবানকে ধন্যবাদ যে, এইরূপ উত্তেজনাপূর্ণ অত্যাচার সত্ত্বেও আমি শান্ত থাকিতে পারিয়াছিলাম এবং আমার ছড়ি আমি ব্যবহার করি নাই, তাহা না হইলে ঘটনা অতি সাংঘাতিক রূপ ধারণ করিত। আমি সেই যুবকদিগকেও ধন্যবাদ দেই যারা আমার আদেশ অনুসারে প্রতিহিংসা না লইয়া চুপ করিয়া বসিয়া ছিল।

যে-পুলিশ কর্ম্মচারী আমাকে আঘাত করিয়াছিল, আমার অঙ্গুলিদ্বারা তাহাকে নির্দ্দেশ করিয়া বহুবার আমি তাহার নাম জিজ্ঞাসা করি। কিন্তু নিজের নাম বলিবার সাহস ও ভদ্রতা তাহার ছিল না।...

"নিরস্ত্র জনতা কোনোরূপ উত্তেজনার কারণ না দেওয়া সত্ত্বেও এবং উহাকে বেআইনী ঘোষণা বা কোনোরূপ সতর্ক না করিয়া সেই জনতার উপর প্রথমেই লাঠি চালাইতে আরম্ভ করা যে-কোনো লোকের পক্ষে অত্যন্ত কাপুরুষতার কাজ,—কোনো পদস্থ কর্ম্মচারীর পক্ষে উহা যে আরো কত জঘণ্য তাহা বলা যায় না। আমি বরং একভাবে এই মনে করিয়া খুসী হইয়াছি যে এই গবর্ণমেণ্ট এইরূপ কাপুরুষ কর্ম্মচারী-দের দ্বারা দেশ শাসন করে; কারণ, ইহাদের সংখ্যা যত বাড়িবে ভারতের মুক্তির দিন ততই নিকবর্ত্তী হইবে।...

"আমি এই বক্তৃতামঞ্চ হইতে আজ এই ঘোষণা করিতেছি যে, আমাদিগকে আজ লাঠিদ্বারা যে-আঘাত দেওয়া হইয়াছে তাহা আঘাত দান নয়—প্রকৃতপক্ষে উহা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের চিতাগ্নিতে নূতন কাষ্ঠদান। যে ব্যক্তি আজ উহা দেখিয়াছে, সে জীবনে তাহা ভুলিতে পারিবে না। ইহা আমাদের হৃদয়ে অতি গভীরভাবে প্রবিষ্ট হইয়াছে। এই কাপুরুষতার প্রতিহিংসা আমাদিগকে লইতে হইবে,—

উহাদিগকে আক্রমণ করিয়া নয়—আমাদের স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়া। আমি গবর্ণমেণ্টকে এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দিতে চাই,—যদি ভীষণ বিপ্লব এদেশে সংঘটিত হয়, তবে সেই জন্য দায়ী হইবে এইসব ইউরোপীয় কর্ম্মচারীরা, যাহারা আজ বিকালে এইরূপ অসৎব্যবহার করিয়াছিল। আমাদের পন্থার নীতি এখনো বিলুপ্ত হয় নাই—শান্তিপূর্ণ অহিংসাদ্বারা লক্ষ্যআয়ত্বের জন্য এখনো আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ। কিন্তু যদি গবর্ণমেণ্ট ও উহার কর্ম্মচারীরা এইরূপ ব্যবহার করিতে থাকে তাহা হইলে যুবকেরা যদি আমাদের কথা না মানিয়া স্বাধীনতা লাভের জন্য নিজেদের ইচ্ছানুরূপ পন্থা অবলম্বন করে তবে আমি আশ্চর্য্য হইব না। আমি জানি না তখন আমি বাঁচিয়া থাকিব কিনা—কিন্তু বাঁচিয়া থাকি বা না থাকি, যদি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক তাহারা সেই অবস্থায় পড়িতে বাধ্য হয়, পরলোক হইতে আমার আত্মা তাহাদের এই সংগ্রামের জন্য তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবে।

"গবর্ণমেণ্ট যদি ইচ্ছা করিয়া থাকে যে, সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে আমাদের মনোভাবের এই প্রকাশ কমিশনকে দেখিতে দিবে না, তাহা হইলে কমিশন যখন এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাতায়াত করে তখন তাহাদের চোখের উপর পটি বাঁধিয়া দেওয়াই সরকারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পন্থা

হইবে।···আজ আমাদের উপর যে আঘাত পড়িয়াছে, যাঁহারা কমিশনের সহিত সহযোগিতা করিতেছেন আমার সেই স্বদেশ-বাসীরাও এজন্য দায়ী—প্রধান আসামী তাঁহারা না হইলেও, তাঁহারা আসামীর সাহায্যকারী।······

"ন্যায়-সঙ্গত পন্থায় নিরুপদ্রবভাবে স্বরাজ লাভের চেষ্টার জন্য আমি এখনো আপনাদিগকে পরামর্শ দিতে চাই। যদি আমাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়—আমার আশঙ্কা যে উহা ব্যর্থ হইতে বাধ্য, তাহা হইলে আমরা এই ক্ষেত্র হইতে সরিয়া দাঁড়াইব এবং আপনাদের ইচ্ছানুরূপভাবে ইহা চালনা করিবার পূর্ণ অধিকার দিব।"···

ষ্টেশনের ঘটনা সম্বন্ধে সরকারী রিপোর্ট বাহির হয় এবং ইংরেজদের কতকগুলি পত্রিকায় ইহার ভুল বা মিথ্যা বিবরণ প্রকাশিত হয়। সরকারী রিপোর্ট সম্বন্ধে লালাজী বলিয়াছেন,—"সরকারী রিপোর্ট মিথ্যায় পরিপূর্ণ এবং যে-ব্যক্তি সরকারকে ঐ বিবরণ দিয়াছে সে অতি জঘন্য মিথ্যা-বাদী। আমি এজন্য সেই ব্যক্তিকে আমার নামে মানহানী মোকদ্দমা আনিবার জন্য আহ্বান করিতেছি, তাহা হইলে পুলিশের কার্য্যসমূহ আমি আদালতে প্রকাশ করিতে পারিব। ···এই বিষয়ে যতই আমি চিন্তা করিতেছি ততই আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিতেছে যে, আমাকে যে আঘাত করা হইয়াছিল

তাহা পূর্ব্ব হইতেই স্থির করা ছিল এবং তাহা সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃত।”

তাঁহার মৃত্যুর পর সমগ্র দেশ ব্যাপিয়া এই প্রশ্ন উঠিল,—এ মৃত্যু, না হত্যা? বিশিষ্ট ডাক্তারগণ—যাঁহারা আঘাতের পর হইতে প্রত্যহ লালাজীকে দেখিয়াছেন, সকলেই একবাক্যে বলিয়াছেন,—পুলিসের এই আঘাত না পাইলে এত শীঘ্র তাঁহার জীবনের শেষ হইত না। পুলিশের আঘাতই তাঁহার মৃত্যুর কারণ। আঘাতের পর লালাজী স্বয়ং দেওয়ান চামনলালকে বলিয়াছিলেন, “তুমি তো জান, উহারা আমাকে হত্যা করিতেই চাহিয়াছিল।” হায়! তখনো তিনি জানিতেন না যে উহাদের এই হত্যার চেষ্টা সফল হইবে।

তাঁহার মৃত্যুর পর এক বিরাট জনসভায় দেওয়ান চামনলাল যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহা উল্লেখযোগ্য। ঘটনার বিবরণ দিয়া তিনি বলিলেন,—“৩১শে অক্টোবর আমি লালাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই এবং তাঁহার আঘাত সাংঘাতিক কিনা জিজ্ঞাসা করি। লালাজী বলিলেন, “তুমি তো জান আমাকে হত্যা করাই উহাদের উদ্দেশ্য ছিল।”…এখন আসামী কে? আসামী পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট—আসামী-ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট—আসামী ব্রিটিশ সাম্রাজ্য।…

লালাজীর এই অসময়ে হঠাৎ মৃত্যুতে পাঞ্জাবের রাজনীতি-ক্ষেত্রের যে-স্থান শূন্য হইল,—তাহা পূর্ণ হইবার নয়। লালাজীর কাজ সত্যিকার প্রত্যেক ভারতবাসীর হৃদয়ে চিরজীবিত থাকিবে, কারণ ভারতের জন্যই তিনি জীবন ধারণ করিয়া ছিলেন এবং ভারতের জন্যই তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন। আমি নিজে ইহা বিশ্বস না করিবার কোনো কারণ দেখিতে পাই না এবং আমি মনে করি কোনো আত্মসম্মান-পরায়ণ ভারতবাসী বিশ্বাস না করিয়া পারিবে না যে, লালাজীকে হত্যা করা হইয়াছে!"

লালাজীর মৃত্যুর পর বোম্বাইয়ে তাঁহার স্মৃতি-তর্পণের জন্য যে সভা হয়, উহাতে শ্রীযুক্ত যমুনাদাস মেটা বলেন,—"লালাজী সাইমন কমিশন বয়কট করিবার জন্য এসেম্ব্লীতে প্রস্তাব করেন। তাঁহার বক্তৃতা কমিশনের মৃত্যু ঘটাইয়াছিল কিন্তু অবশেষে কমিশন তাঁহাকে হত্যা করিল।"

তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা-জ্ঞাপনের জন্য সমগ্র দেশ ব্যাপিয়া শত-সহস্র জনসভা আহুত হইয়াছে। সর্ব্বশ্রেণীর শত-সহস্র শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি তাঁহার মৃত্যুতে ব্যথিত মর্ম্মাহত হইয়া তাঁহার স্মৃতি-তর্পণ করিয়াছেন। দেশের শীর্ষস্থানীয় সর্ব্বজনপূজ্য মহাপুরুষের দেহে বিনা কারণে ও বিনা অজুহাতে পুলিশের এই কঠোর আঘাত ও তজ্জন্য তাঁহার মৃত্যু, দেশবাসী কোনো

দিন ভুলিতে পারিবে না। এই শোকপূর্ণ ঘটনার পরিণাম বহুদূর বিস্তৃত। ডাঃ বেসান্ত 'নিউ ইণ্ডিয়া' নামক কাগজে লিখিয়াছেন,—"লাহোরের এই অত্যাচার ও রক্তপাত ভবিষ্যৎ বিপদের সূচনা করিতেছে। ইংলণ্ড কি আমেরিকার উপনিবেশগুলির মত ভারতকেও হারাইবে? কেননা, ভারতের শ্রেষ্ঠ মনীষি ও হৃদয়বাণ ব্যক্তিরা লাহোরের এই অত্যাচারের অধিক পুনরাভিনয় সহ্য করিবে না।...পাঞ্জাব সে প্রদেশ নয়, যার সহিত এরূপ ব্যবহার করা চলে। এ প্রদেশের লোকেরা পৌরুষপূর্ণ এবং উগ্রতা ও অত্যাচার দ্বারাই অত্যাচারের প্রতিবিধান করিতে প্রস্তুত। যদি সেখানে জনসাধারণের কোনোরূপ উগ্রতা প্রকাশ পায়, তবে মনে রাখিতে হইবে যে, ইউরোপীয় কর্ম্মচারীরাই উহা আরম্ভ করিয়াছিল।...লাহোরের এই ঘটনা স্বাধীনতা-সংগ্রামকে প্রচুর শক্তিদান করিবে, কেননা, ইহা অসহ্য যে আমাদের শ্রদ্ধেয় নিরস্ত্র নেতারা এইরূপ পাশবিক ব্যবহার পাইয়া থাকেন।"

শুধু দেশের শ্রদ্ধেয় নেতারা নয়, জনসাধারণের মুখপত্র নানা সাময়িক পত্রিকাও লাহোরের এই অত্যাচারে ক্ষুব্ধ মর্ম্মাহত হইয়া পড়িয়াছে। দেশবাসীর এমন কোনো সংবাদ-পত্র বা সাময়িক পত্রিকা নাই, যাহা সরকারের এই অত্যাচারের তীব্র সমালোচনা ও নিন্দা না করিয়াছে। 'তেজ' নামক সংবাদপত্র লিখিয়াছেন,—"নেতাদের প্রতি এই আক্রমণ ও অত্যাচার তাঁহাদের অপমানজনক নয়,—প্রকৃতপক্ষে ইহা গবর্ণমেণ্টেরই অপমানের কথা—যার কর্ম্মচারীরা এইরূপ

জঘণ্য অমানুষিক কাজ করিয়াছিল। ইহা হঠাৎ একটা দৈবঘটনা নয়—মনে হয় এই কাজ যথেষ্ট চিন্তাপ্রসূত এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সংঘটিত।”

এ বিষয়ে সকল সংবাদপত্রের মতামত আলোচনা করিবার স্থান এই ক্ষুদ্র পুস্তকে সম্ভব হইবে না। শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এই শোকপূর্ণ ঘটনা ভারতকে বুঝাইয়া দিয়াছে, সে কত অসহায়; আর সেই সঙ্গে তাহার হৃদয়ে যে দারুণ অন্তর্দ্দাহের সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে তাহার পরিণাম সুদূরপ্রসারিত। এই ঘটনায় ভারতাকাশে যে কালো মেঘ দেখা যাইতেছে তাহা ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া যদি প্রবল ঝটিকায় পরিণত হয়, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কারণ থাকিবে না। চিন্তাশীল ব্যক্তিরা তাহার সূচনা দেখিতেছেন।

মানুষ ভাবিয়া পায় না, কি করিয়া পুলিশ লাজপৎ রায়ের মত ব্যক্তির দেহে বিনা কারণে আঘাত করিতে পারে। তিনি দেশপূজ্য নেতা ছিলেন বলিলে খুব সামান্যই বলা হয়। ইংলণ্ডের, এমন কি, সমগ্র ইউরোপের রাজনৈতিক নেতাদের ভিতর তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখিলেও লাজপৎ রায়ের সমকক্ষ একজন ব্যক্তিও পাওয়া যাইবে না। লালাজী দেশের জন্য যত কাজ করিয়াছেন এবং দেশের জন্য যত দুঃখ সহিয়াছেন, সে বিষয়ে কোনো দেশের কোনো নেতা তাঁর পাশে দাঁড়াইবার উপযুক্ত নয়। কোনো ব্রিটিশ রাজনৈতিক নেতার হৃদয়ে তাঁহার মত উচ্চ আদর্শ বর্ত্তমান নাই এবং লাজপৎ রায় তাঁর দেশের যে পরম সম্পদ ছিলেন, কোনো

ব্রিটিশ রাজনৈতিক নেতা তার দেশের সেই সম্পদ নয়।

কিন্তু তবু ব্রিটিশ মনোভাব তাঁহাকে লাঞ্ছনা করিতে ও মৃত্যুর কারণ হইতে দ্বিধা বোধ করে নাই। কি করিয়া ইহা সম্ভব হইল ?—এ কোন অদ্ভুত মনোভাব ?

শ্রদ্ধেয় রামানন্দবাবু এই মনোভাবের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলেন, ইম্পিরিয়েলিজম্ নামক সাম্রাজ্য-পূজাই তাঁহার মৃত্যুর কারণ। তাঁহার মতে এই ইম্পিরিয়েলিজম্ যে-মনোভাব প্রণোদিত হইয়া এই কাজ করিয়াছে তাহা যদি পরিস্ফুট করিয়া ভাষায় ব্যক্ত করা যায় তবে তাহা এইরূপ দাঁড়ায়,—

"তুমি, লাজপৎ রায়, তোমার দেশবাসীর নিকট সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হইতে পার ; তোমার কোটি কোটি দেশবাসী তোমাকে ভালবাসিতে পারে ও শ্রদ্ধা করিতে পারে ; জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে তুমি তাদের জন্য প্রচুর কাজ করিয়া থাকিতে পার ; যতটা কাজ তুমি করিয়াছ তার চেয়ে আরো অনেক বেশি করিবার ইচ্ছা তোমার হৃদয়ে থাকিতে পারে ; স্বাধীন দেশে জন্মগ্রহণ করিলে তোমার ইচ্ছানুরূপ যে-কোনো স্থান তুমি অধিকার করিতে পারিতে ; তোমার খ্যাতি স্বদেশ ছাড়াইয়া পৃথিবীময় ব্যপ্ত থাকিতে পারে,—কিন্তু তবু আমার পায়ের জুতার নীচেকার একখণ্ড মৃত্তিকা বই তুমি আর কিছুই নও। হও না কেন তুমি তোমার দেশপ্রিয় শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি, তবু দু'পয়সার এক সার্জ্জেণ্ট বা আধ-পয়সার এক কনেষ্টবলের বিনা কারণে বিনা অজুহাতে লাঠির আঘাত দ্বারা তোমাকে লাঞ্ছনা করিতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধাবোধ করিবার কারণ নাই।

'তোমার স্বদেশবাসী তা'তে ক্ষুব্ধ হইতে পারে। কিন্তু আমি তাদের প্রতি আমাব বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করি।"

লাজপৎ রায় নাই। অত্যাচারীর কলুষ আঘাতে তাঁর প্রাণ গিয়াছে। মনে হয় যিশুর ন্যায় তাঁহার অসামান্য মানবতাপূর্ণ উদার মুক্ত আত্মা আজ বলিতেছে,—"ভগবান, এদেরে ক্ষমা কর—এরা জানে না, এরা কি করিতেছে।" লাজপৎ রায় নাই,—কিন্তু তাঁর মহান জীবনের আদর্শ তিনি অক্ষয় সম্পদরূপে আমাদিগকে দান করিয়া গিয়াছেন। ভারত আজ শোকে মুহ্যমান হইয়া থাকিলে চলিবে না। তাহার হৃদয়ে অবসাদ আনিবার কারণ নাই। কারণ লালাজী স্বয়ং বলিয়াছেন,—"জহ্লাদের ফাঁসির রজ্জু বা তার কুঠার, বন্দুকধারীর গোলা শুধু ব্যক্তিগত জীবনেরই অবসান ঘটাইতে পারে; তার ফলে সঙ্ঘবদ্ধ জীবন আরো সজীব ও শক্তিশালী হইয়া উঠে। বহিষ্করণ, নির্ব্বাসন, কয়েদ, অত্যাচার ও বাজেয়াপ্ত—এইগুলিই অত্যাচারীর অস্ত্র, যাহা দ্বারা সে স্বাধীনতাকে গলা-টিপিয়া মারে বা যাঁরা স্বাধীনতাকামী তাঁদের জীবনের অবসান ঘটায়। কিন্তু অদ্যাবধি উহারা স্বাধীনতাকে হত্যা করিতে সক্ষম হয় নাই।"

যে-কোনো পরাধীন দেশের ইতিহাস লালাজীর এই উক্তির সাক্ষ্য দিবে। স্বদেশের ইতিহাসের দিকে তাকাইলেও সেই সত্যের উপলব্ধি করা যায়। এই অল্প দিনের ইতিহাস—স্বদেশীর যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত এই এক-চতুর্থ শতাব্দির ইতিহাসও কি আমাদের প্রাণে সেই সত্যের উপলব্ধি জাগায় না? ১৯০৫ সন হইতে আজ পর্য্যন্ত কত মুক্তিকামী

সৈনিক স্বদেশের জন্য প্রাণ দিয়াছে! নিরীহ জাতি শঙ্কিত দৃষ্টি মেলিয়া কাহারো কাহারো শবের শোভাযাত্রা দেখিয়াছে,—বুঝিতে পারে নাই কি তাহারই আশা আকাঙ্ক্ষা—তাহারই স্বাধীনতার স্বপ্ন লইয়া ঐ দেহ শ্মশানতলে ভস্ম হইল! সেই ভস্মস্তূপের মধ্যে লুক্কায়িত অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ পুনঃ পুনঃ দাবানলের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিয়াছে। আবার নূতন বীর মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে।—আবার বিদ্বেষ-বিষ-তিক্ত সাম্রাজ্যবাদ তাহাকে ভস্ম করিয়া দিয়াছে। জাতি নৈরাশ্যে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ভাবিয়াছে—যজ্ঞাগ্নি নির্ব্বাপিত হইল! কিন্তু অগ্নি তো নির্ব্বাপিত হয় নাই—স্বাধীনতা-সংগ্রাম তো আজো তেমনি জোরের সহিত চলিতেছে।···সেই কথা মনে রাখিয়া জাতির প্রাণে আজ আশা রাখিতে হইবে—নৈরাশ্যের হাতে নিজেকে ছাড়িয়া দিলে চলিবে না।

কবি দেশবন্ধুর মৃত্যুতে লিখিয়াছিলেন :—

“এনেছিলে সাথে ক'রে মৃত্যুহীন প্রাণ,
মরণে তাহাই তুমি করি' গেলে দান।”

লাজপৎ রায় সেই মৃত্যুহীন প্রাণের অধিকারী ছিলেন। তাঁহার প্রাণের আগুন দিয়া তিনি সহস্র প্রাণ স্পর্শ করিয়াছেন। তাঁহার এই মৃত্যুতে সেই আগুন আরো উজ্জ্বল হইয়াছে। সমগ্র দেশবাসী সেই আগুনের পরশমণির স্পর্শ লাভ করুক ও সাগ্নিক ব্রাহ্মণের ন্যায় সেই আগুন চির-অনির্ব্বাণ রাখুক,—এই কামনা করি।